যতীন্দ্রমোহন বাগচীর
শ্রেষ্ঠ কবিতা

যতীন্দ্রমোহন বাগচীর

শ্রেষ্ঠ কবিতা

গোরা সিংহরায়
-সম্পাদিত

ভারবি

১৩/১ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রিট। কলকাতা-৭৩

প্রথম প্রকাশ : আশ্বিন ১৪০৮, সেপ্টেম্বর ২০০১

প্রকাশক · গোপীমোহন সিংহরায়। ভারবি। ১৩/১ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রিট।
কলকাতা-৭৩। অক্ষরবিন্যাস : ভারবি। মুদ্রক : শ্যামলী ঘোষ।
কল্যাণী প্রিন্টার্স। ১৭ কানাই ধর লেন। কলকাতা-১২

মূল্য : আশি টাকা



'রবীন্দ্র-প্রভাব অতিক্রম করে সত্যকারের ভালো কবিতা লেখা এ যুগে কার পক্ষেই বা সম্ভব হয়েছে? শুধু প্রভাব অতিক্রম করবার ঝোঁকে কাব্যের রাজপথ ছেড়ে বন-জঙ্গল হাতড়িয়ে বেড়ানোর প্রয়াস যতীন্দ্রমোহন করেননি। ... রবির তেজ নিজের বুকে সম্পূর্ণ ধারণ করে তাকে শীতল সুন্দর ও সাধারণ চোখের গ্রহণযোগ্য জ্যোৎস্নারূপে এই ধরণীতে পাঠিয়ে দেয় আকাশের চন্দ্র। ... চন্দ্রের নিজের আলো নেই, সে সূর্যের আলোয় আলোকিত মাত্র, কিন্তু তারাগুলি এক-একটি বৃহৎ সূর্য। এতে রসবাজ্যে পূর্ণচন্দ্রের গৌরব ক্ষুণ্ণ হয় না, মিটমিটে তারাগুলির গৌরবও বাড়ে না। সূর্য—সূর্য; চন্দ্র—চন্দ্র; রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ; যতীন্দ্রমোহন, যতীন্দ্রমোহন।'[১]

২

বাল্যকালেই যতীন্দ্রমোহনের সাহিত্য-সাধনার উন্মেষ। তিনি তাঁর স্মৃতিকথায় লিখছেন, 'আমি তখন হেয়ার স্কুলের পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্র, যখন বিদ্যাসাগর মহাশয় স্বর্গগত হইলেন (২৯ জুলাই, ১৮৯১); মনে আছে, একটা অতি বড় দুঃখ বোধ করিলাম এবং সেই দুঃখে একটা কবিতাও লিখিয়া ফেলিলাম; উহা ক্লাসের সকল ছাত্রের চাঁদা করা খরচে ছাপাও হইল। ঐ রচনাই আমার প্রথম মুদ্রিত কবিতা। সত্যকার কষ্টের অনুভূতি হইতেই সেদিন উহার জন্ম হয়।'[২] মাত্র ২০ বছর বয়সে সুরেশচন্দ্র সমাজপতি-সম্পাদিত 'সাহিত্য' (ফাল্গুন ১৩০৫) পত্রিকায় যতীন্দ্রমোহনের 'কাল আঁখি' কবিতাটি প্রকাশিত হয়। ১৮৯৮ সাল থেকে বহু পত্র-পত্রিকাতেই তাঁর রচনা প্রকাশিত হতে থাকে। তাঁরই ভাষায়, 'এই সময় হইতেই আমার কবিতার বুলি ফুটিতেছে এবং সাহিত্য, ভারতী-প্রভৃতি পত্রিকার পত্রান্তরালে দু-একটি রচনার মক্সো করিতেছি ..।' ১৯০৪ সালে দেবেন্দ্রনাথ সেনের 'হরিমঙ্গল' কাব্যে তাঁর 'ভুল' ও 'প্রার্থনা' কবিতা-দুটি সংকলিত হয়। ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দের মে মাসে যতীন্দ্রমোহনের প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'লেখা' প্রকাশিত হয়। 'লেখা' কাব্যগ্রন্থের অধিকাংশ কবিতা পূর্বেই 'সাহিত্য', 'ভারতী', 'বঙ্গদর্শন' ও 'প্রবাসী' পত্রিকায় প্রকাশিত। এই কবিতাগুলি সম্পর্কে কবির স্বীকারোক্তি: 'আমার প্রথম কাব্য "লেখা" গ্রন্থখানি আমার অনুরোধে কবি (রবীন্দ্রনাথ) আদ্যন্ত অতি সযত্নে দেখিয়া দিয়াছিলেন। কাঁটিয়া-ছাঁটিয়া, মাঝে-মাঝে দু-চার ছত্র নিজ হইতে যোগ করিয়া দিয়াও তিনি যেভাবে আমাকে উৎসাহিত করিয়াছিলেন, সে

১. পূর্বাচল, ফাল্গুন ১৩৫৪ যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত; ২. রবীন্দ্রনাথ ও যুগসাহিত্য। যতীন্দ্রমোহন বাগচী।

কথা আমার ইহজীবনে ভুলিবার নহে। ঐ গ্রন্থ তাঁহারই চরণে উৎসর্গ করিয়া আমি ধন্য হইয়াছি।'[৩]

৩

সমকালীন লেখক ও বরেণ্য ব্যক্তিদের সংস্পর্শে আসেন তিনি অল্প বয়সেই। জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে ছিল তাঁর অবাধ বিচরণ। শান্তিনিকেতনে কবিগৃহের পাশেই থাকার সুযোগ পেয়েছিলেন। তাই 'কবির সান্নিধ্য তখন যেমন সহজ ও তেমনি সুখকর হইয়া উঠিবার সুযোগ ছিল।' ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, স্বামী বিবেকানন্দ-প্রভৃতির স্নেহ-সাহচর্য লাভ করেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে বিংশ শতাব্দীর সাহিত্য-আন্দোলনের বিভিন্ন ধারার সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষে যুক্ত ছিলেন তিনি। সাহিত্য-জগতের মধ্যে যে চিরন্তন ঈর্ষা-দ্বন্দ্ব-প্রতিযোগিতা ছিল, যতীন্দ্রমোহন তার উর্ধ্বে ছিলেন। 'ভারতী' গোষ্ঠীর কবিরা ছিলেন তাঁর কাছের মানুষ। সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়, কালিদাস রায়, দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ বাগচী-প্রমুখের সঙ্গে কাব্যাদর্শাগত ঐক্যে ঘনিষ্ঠতা ছিল গভীর।

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত লিখছেন ১৩১৮ সালের কথা : 'বাগচি কবির বৈঠকখানায় কলকাতার একটা সেরা মজলিস্ বসত। বহু গুণী—গায়ক ও সাহিত্যিক—সে মজলিসে জমায়েত হতেন। বাংলাদেশের সব জ্যোর্তিময় নক্ষত্র—গ্রহপতি স্বয়ং যতীন্দ্রমোহন। কোথায় কোন ভাঙা দেওয়ালের আড়ালে 'নূতনের কেতন উড়ছে' কোথায় কার মাঝে মৃদুতম সম্ভাবনা, ক্ষীণতম প্রতিশ্রুতি ... আভাস একবার পেলেই উদ্বেল হৃদয়ে আহ্বান করে আনতেন। তাঁর বাড়ির দরজায় যে হাসনাহানার গুচ্ছ ছিল তার গন্ধ প্রীতিপূর্ণ হৃদয়ের গন্ধ।'[৪] যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত তাঁর বন্ধুর সম্বন্ধে লিখেছেন, 'আমাদের কবিতাগত, ভাবগত ও প্রকৃতিগত পার্থক্য ছিল প্রচুর। কিন্তু যতীন এমন কৌশল আয়ত্ত করেছিল যাতে আমার স্বভাব-বন্ধুরতাগুলো তার বান্ধবতাকে আঘাত করতে পারত না, বরং সে নিপুণভাবে মৈত্রীবন্ধনের অনুকূল কবে নিত।'[৫] "করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় লিখছেন কবিতায় : 'তোমারে বরণ করি যতীন্দ্রমোহন/লহ বন্ধু অন্তরের প্রেম-নিবেদন/কবি স্বপ্নলোকে পশি প্রথম যৌবনে/পেয়েছি তোমার সঙ্গ রস আলাপনে।' (যতীন্দ্রমোহন : করুণানিধান কাব্যসংগ্রহ) মোহিতলাল মজুমদারের স্বীকৃতি : 'কবি যতীন্দ্রমোহনের কাব্য আমার সাহিত্যিক জীবনের উন্মেষকালের সহিত একটি সুমধুর স্মৃতি জড়িত হইয়া আছে।' শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় লিখছেন কালিদাস রায়কে : 'যতীনকে আমি সত্যই ভালোবাসি। শুধু কেবল কবি বলে নয়, তার ভেতর এমনি একটি স্নেহ-সরল, বন্ধু-বৎসল, ভদ্র মন আছে যে তার স্পর্শে নিজের মনটাও তৃপ্তিতে ভরে আসে। যতীন জানেন, আমি তাঁর

৩. রবীন্দ্রনাথ ও যুগসাহিত্য। যতীন্দ্রমোহন বাগচী; ৪. কল্লোল যুগ, ১৩৩৬। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত; ৫. 'মিতার স্মরণে', পূর্বাচল, ফাল্গুন ১৩৫৪। যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

কবিতার একান্ত অনুরাগী। যখন যেখানেই তাদের দেখা পাই, বারবার করে পড়ি। স্নিগ্ধ সকরুণ নির্ভুল ছন্দগুলি কানে-কানে কত কি বলতে থাকে।' কবি নজরুল ইসলামের কণ্ঠে বিস্ময় : 'তুমি কোন পথে এলে হে মায়াবী কবি বাজায়ে বাঁশের বাঁশরি'।

যতীন্দ্রমোহনের লেখনীতে বলিষ্ঠতারও অভাব ছিল না। 'মানসী' প্রকাশিত হবার অল্পদিনের মধ্যেই সাহিত্য পত্রিকায় (১৩১৬, জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা) দ্বিজেন্দ্রলাল রায় 'কাব্যে নীতি' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথকে আক্রমণ করেন। তরুণ লেখক যতীন্দ্রমোহন 'মানসী'র ভাদ্র সংখ্যায় 'কাব্যে নীতি' প্রবন্ধে লেখেন : 'পাপ কলি বোধ হয় পূর্ণ হইল; নতুবা কল্কি-অবতারের সাক্ষাৎ কেন? সর্বতোমুখী প্রতিভা আজ হাসির গান ত্যাগ করিয়া, থিয়েটারের গ্যালারি মাতাইয়া, অনুকরণে শিশুশিক্ষা পুস্তক রচনার অবসানে, সমালোচনার রঙ্গমঞ্চে নূতন রূপ ধরিয়া অবতীর্ণ—জীবের আর ভাবনা নাই।'

৪

যতীন্দ্রমোহনের কাব্যগ্রন্থ মোট নয়টি : লেখা (১৯০৬); রেখা (১৯১০); অপরাজিতা (১৯১৩); নাগকেশর (১৯১৭), বন্ধুর দান (১৯১৮); জাগরণী (১৯২২); নীহারিকা (১৯২৭); মহাভারতী (১৯৩৬); পাঞ্চজন্য (১৯৪১); এছাড়া 'কাব্য-মালঞ্চ' কবিতা-সংকলন ১৯৩৬-এ প্রকাশিত হয়। তাঁর একমাত্র প্রবন্ধের বই : 'রবীন্দ্রনাথ ও যুগসাহিত্য' (১৯৪৭) এবং উপন্যাস : 'পথের সাথী'। কয়েকটি পত্রিকাও তিনি সম্পাদনা করেন। যথা : মানসী (ফাল্গুন ১৩১৭-চৈত্র ১৩২০); যমুনা (১৩২৮-২৯) ও পূর্বাচল (মাঘ ১৩৫৪)। প্রায় অর্ধ-শতাব্দীকাল তিনি বাঙলা-সাহিত্যের সেবা করে গিয়েছেন।

৫

'যতীন্দ্রমোহনের কবিতার প্রধান গুণ চিত্রলিপিকুশলতা। ছন্দে ও শব্দে তাঁহার অধিকার নির্বাধ। বিষয়েও বিচিত্রতা আছে। সমসাময়িক কবিদের মতো তাঁহারও রচনায় পল্লী-প্রীতির প্রকাশ এবং ভাগ্যহত-নিপীড়িত নারীর প্রতি সমবেদনা প্রকাশিত। যতীন্দ্রমোহনের কবিতায় আবেগ খুব স্পষ্ট নয়, যেটুকু আছে তাহাতে রচনার বেগের সঞ্চার করিয়াছে। জীবন বা জগৎ সম্পর্কে কোন বক্র দৃষ্টিভঙ্গির প্রকাশ নাই। ইহার কবিতার সৌন্দর্য প্রসন্ন-সরলতায়।'[৬] প্রথম কাব্য 'লেখা'য় যতীন্দ্রমোহন ছন্দে-ভাষায় রবীন্দ্রপন্থী।

১৯১০ সালে প্রকাশিত দ্বিতীয় কাব্য 'রেখা' পড়ে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর লেখেন, 'তোমার "রেখা" পড়িয়া মুগ্ধ হইলাম। তোমার কবিতায় চিত্রাঙ্কনী-প্রতিভারও পরিচয় পাওয়া যায়। এক-একটি ছোটখাটো রেখার টানে গ্রাম্যদৃশ্যগুলিও কেমন ফুটিয়া উঠিয়াছে। তোমার কবিতায় 'ফড়িং' ও 'প্রজাপতি' আদর পাইয়াছে। তোমার ছন্দোবন্ধ সুমধুর; ভাষাও ভাবের উপযোগী। কোন-কোন কবিতায় সুললিত সংস্কৃত শব্দের প্রাচুর্য, আবার গ্রাম্য-দৃশ্যের বর্ণনায় ভাবব্যঞ্জক চলিত গ্রাম্য-শব্দের নিপুণ প্রয়োগ

৬. বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, চতুর্থ খন্ড। সুকুমাব সেন

দেখিতে পাওয়া যায়। তোমার "রেখা" বঙ্গসাহিত্যের মুখ উজ্জ্বল করিবে।' এই কাব্য-পাঠে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের মন্তব্য : 'কাজলাদিদির কবিতাটি সোনার অক্ষরে ছাপান উচিত ছিল। কয়েকটি কবিতা উচ্চ-অঙ্গের, বঙ্গসাহিত্যে নূতন। আপনি রবিবাবুর ঝঙ্কার কতক পাইয়াছেন।' দেবেন সেন লিখছেন : '... লেখা নয়—যেন কতকগুলি কোহিনূর, পদ্মরাগ, ইন্দ্রনীল, চন্দ্রকান্ত!' অতঃপর ১৯১৩ ও ১৯১৭-এ যথাক্রমে প্রকাশিত হয় 'অপরাজিত' ও 'নাগকেশর'। 'নাগকেশর'-সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ এক চিঠিতে (১৭ কার্তিক ১৩২৪) কবিকে লেখেন : 'দেখিলাম তোমার লেখনী তোমার কবিত্বকে পক্ষীরাজ ঘোড়ার মতন এখনো সমান বেগে বহিয়া চলিয়াছে। এখনো তাহার ক্লান্তির লক্ষণ নাই, বরঞ্চ নিজের গতিবেগে সে যেন আরো মাতিয়া উঠিয়াছে।' ১৯১৮ সালে প্রকাশিত যতীন্দ্রমোহনের আর-একটি কাব্যগ্রন্থ, 'বন্ধুর দান'। রবীন্দ্রনাথের 'পলাতকা'র কবিতাগুলি প্রকাশিত হলে, যাঁরা এই-ধরনের কবিতার ভাবানুসারী হয়েছিলেন, যতীন্দ্রমোহন তাঁদের অন্যতম। এখানে রবীন্দ্রনাথের 'কাহিনী' কাব্যের ভাষা, উপমা ও ভাববস্তুর সাযুজ্য অনেকাংশে লক্ষিত হয়। ১৯২৭-এ 'নীহারিকা' কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হলে রবীন্দ্রনাথ লেখেন : 'তোমার কাব্যগ্রন্থের নাম দিয়েছ নীহারিকা। কেন দিয়েছ? ঝাপসা তো কিছুই দেখছিনে—তোমার সুর-বাঁধা বীণা পাকা হাতেই বাজাচ্চ, রাগিণী স্পষ্ট হয়েই ফুটে উঠবে—ভাষাও যেমন-তেমন নয়, ছন্দেরও তাল কাটে না, রসেরও দীনতা বা অনিশ্চয়তা নেই।'

৫

প্রকৃতি-প্রীতি . গ্রামবাংলার নিসর্গ সৌন্দর্যকে যতীন্দ্রমোহন গভীর অনুরাগে কবিতায় প্রকাশ করেছেন। রোমান্টিক কবি প্রকৃতিকে ভালোবেসেছেন, মানুষকে ভালোবাসতে শিখে। পল্লীকে তিনি ভালোবাসেন বলেই যেন পল্লী আরও সদা-সুন্দর। নদীয়া জেলার যে ছোট্ট গ্রামে কবির জন্ম, সেখানকার প্রকৃতি, সেই বাঁশবাগান, কেয়াঝোপ, আম-কাঁঠালের বাগান, রাঙামাটির পথ, পদ্মাদীঘির পার—আর সংকীর্তনের সুর তাঁর প্রিয়। পল্লীর মানুষের প্রতি তাঁর প্রীতি সত্য বলেই তাঁর 'পল্লীকবিতা'গুলি নিছক পল্লীবন্দনায় পরিণত না হয়ে, হৃদয়ের উত্তাপে জীবন-স্পন্দিত। তারই নিদর্শন রয়েছে তাঁর 'জন্মভূমি', 'খেয়া-ডিঙি', 'সরোবরে সন্ধ্যা', 'জ্যোৎস্না-লক্ষ্মী', 'পদ্মাতীরে'-প্রভৃতি কবিতায়। তাঁর প্রেমমুগ্ধতা ও সৌন্দর্য-প্রিয়তার প্রকাশ ঘটেছে 'জন্মভূমি' কবিতায়। 'সরোবরে সন্ধ্যা' ও 'পদ্মাতীরে' কবিতায় তিনি প্রকৃতির ধ্যান-নিমগ্ন রূপ এঁকে প্রকৃতি-চিত্রণে বিশিষ্ট স্থান লাভ করেছেন। 'সরোবরে সন্ধ্যা' ও 'চন্দন-দীঘি' সন্ধ্যাপ্রকৃতির বন্দনা-স্তোত্র। এখানে একই সঙ্গে প্রকৃতির ভাব-চিত্র, ধ্বনি-চিত্র ও দৃশ্য-চিত্রের চমৎকার সংমিশ্রণ ঘটেছে। সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের সঙ্গে তাঁর প্রকৃতি-চিত্রণের ও ছন্দের কিছু মিল পাওয়া যায়—'ফণীমনসার ফুল', 'ঝরনাঝারা', 'নেবুফুল'-ইত্যাদি কবিতায়। আবার দেখি, 'খেয়াডিঙি' কবিতায় শিশুর মতো সারল্য ও মমতা-মাখানো দৃষ্টি . 'টলমলিয়ে ডিঙা আমার চলে তারি কোলে!/জলের গায়ে সিঁদুর ঢেলে সূর্যি ওঠে

পুবে,/দিনের খেয়া সেরে আবার পশ্চিমেতে ডুবে;/বারো মাসে একটি দিনও ছুটি-কামাই নাই,/তারি সাথে আমি আমার ঘাটের ডিঙা বাই।'

প্রেম : যতীন্দ্রমোহনের প্রেমের কবিতায় যেমন গভীর ভাবাবেগ আছে, তেমনি আছে হৃদয়-নিবেদনের শোভন-সংযত প্রকাশ। প্রেমকে তিনি দেখেছেন শান্ত রূপে। রোমাণ্টিক প্রেমের সুমিত প্রকাশে তাঁর কবিতাগুলি অনুপম। 'হাফিজের স্বপ্ন' কবিতায় তা বিশেষভাবে প্রতিভাত। তিরিশ-এর যুগে কল্লোল-পত্রিকাগোষ্ঠীর সঙ্গে যতীন্দ্রমোহনের সম্পর্ক স্থাপিত হয় যে-কবিতাটির মাধ্যমে সেটি হল : 'যৌবন চাঞ্চল্য'—তাতে নবীন প্রেমের জয় ঘোষিত হয়েছে। বহিঃপ্রকাশের চমকে নয়, যৌবন-প্রতিমা-সৃষ্টির সম্পূর্ণতায় তা অনবদ্য : 'ভুটিয়া যুবতী চলে পথ!/টসটসে ভরপুর—/আপেলের মতো মুখ আপেলের মতো বুক/পরিপূর্ণ প্রবল প্রচুর;/যৌবনের রসে ভরপুর।' শুধুমাত্র রোমাণ্টিক প্রেমই নয়—বাস্তব প্রেমের বন্দনাও তিনি করেছেন। পত্নীর অকাল-মৃত্যুর বিয়োগব্যথায় রচিত তাঁর তীব্র বেদনাপূর্ণ কবিতাগুলির অন্যতম 'বিয়োগিনী'। কবি হৃদয়ের শূন্যতার হাহাকার দীর্ঘ-পয়ার ছন্দে সেখানে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত : 'গৃহলক্ষ্মী নহ শুধু, তুমি দেবী, ছিলে মোর বাণী/তব স্পর্শে প্রাণ পেয়ে আমার এ চিত্তবীণাখানি/মুখরি উঠিত নিত্য,—জানুক বা না-জানুক কেহ, ... আজ তুমি ছেড়ে গেছ, পড়ে আছে অন্ধকার কোণে/যন্ত্রের কঙ্কালখানা—কে আর তাহার কথা শোনে!/ধূলিজালে ঢাকে নিত্য, বায়ু আসি নাড়া দিয়ে যায়/হা-হা করে কাঁপে বক্ষ, আজি হায় সে ধ্বনি কোথায়?'

ঐতিহ্য-প্রীতি ও পুরাণের নবজন্ম : ঐতিহ্যপ্রীতি ও জীবন-আনুগত্য যতীন্দ্রমোহনের বিশেষ-ধর্ম। 'মহাভারতী' কাব্যগ্রন্থে 'কর্ণ', 'দুর্যোধন', 'ভীম', 'শবরীর প্রতীক্ষা', 'বাসবদত্তা'-প্রভৃতি কবিতায় তিনি পৌরাণিক কাহিনীগুলিকে নাট্যরূপে সুন্দরভাবে উপস্থাপিত করেছেন। কবিতাগুলির শব্দঝঙ্কার, ছন্দোবৈচিত্র্য ধ্বনিরোল, ঐতিহ্যের পুনঃসৃষ্টিতে যেন পুরাণের নবজন্ম ঘটিয়েছে। 'জীবন-সংরাগের তীব্রতায়, জটিল ব্যক্তিত্বের রূপায়ণে, চিত্রকল্পের যথার্থতায় এদের সমতুল্য কবিতা বাংলা ভাষায় দুর্লভ। সৃষ্ট চরিত্রের সঙ্গে স্রষ্টার অভিন্নতা ছাড়া এ-জাতীয় চরিত্র সৃষ্টি হতে পারে না।'[৭] পরম-শূন্যতা নিঃসীম অন্ধকার যতীন্দ্রমোহনের কাব্যের শেষ কথা নয়। তাঁর মধ্যে প্রশ্ন ছিল, যন্ত্রণা ছিল—তাঁর সৃষ্ট কর্ণের আত্মবিলাপ কিংবা মৃত্যুপথে ধাবিত দুর্যোধনের কণ্ঠে ক্ষাত্রতেজের দীপ্ত প্রকাশ ঘটেছে। রবীন্দ্রসৃষ্ট 'কর্ণকুন্তী-সংবাদ', 'গান্ধারীর আবেদন', 'বিদায় অভিশাপ'-প্রভৃতির সঙ্গে সাযুজ্য লক্ষ্য করা যায়।

হৃদয়-সংবাদ : যতীন্দ্রমোহন জীবনের কবি। তিনি 'এই ধূলি-ধূসরিত মর্ত্য-পৃথিবীর অপরিচিত মানব-মানবীর মধ্যে হৃদয়ের সঙ্গী আবিষ্কার করেছেন, এবং সেই মানব-মানবী তাঁর কাব্যের বিষয়। ... সর্বেন্দ্রিয়ের প্রকাশে তা ব্যাপ্ত ও বিকশিত;

৭. যতীন্দ্রমোহন : কবি ও কাব্য। অলোক রায়

ব্যক্তিগত স্পর্শে তা চিত্ত-সংক্রামক।'[৮] তাঁর 'অন্ধবধূ', 'বঙ্গবধূ'-প্রভৃতি কবিতায় বাঙালি জীবনের নিভৃত সুখ-দুঃখ—বিশেষ করে বাঙালি ঘরের বঞ্চিতা নারীর হৃদয়-বেদনায় স্পন্দিত। যেমন : তাঁর 'অন্ধ-বধূ' কবিতায় : 'পায়ের তলায় নরম ঠেক্‌ল কি !/আস্তে একটু চল্ না, ঠাকুর-ঝি—/ওমা, এ যে ঝরা-বকুল!—নয়? ... টানিস কেন? কিসের তাড়াতাড়ি?/সেই তো ফিরে যাব আবার বাড়ি,/একলা-থাকা সেই তো গৃহকোণ' ইত্যাদি পংক্তিগুলিতে নিঃসঙ্গ অন্ধ গ্রাম্য-বধূর করুণ-কোমল রূপটি অতি আশ্চর্য রূপে প্রকাশিত। কবিচিত্তের এই সহৃদয়তাই ব্যাকুল শিশুচিত্তের বেদনাকে প্রকাশ করেছে তাঁর 'দিদি-হারা' কবিতায় : 'বাঁশবাগানের মাথার ওপর চাঁদ উঠেছে ওই—/মাগো আমার শোলক-বলা কাজ্‌লা-দিদি কই?/পুকুর ধারে নেবুর তলে থোকায় থোকায় জোনাই জলে,—/ফুলের গন্ধে ঘুম আসে না, একলা জেগে রই/মাগো, আমার কোলের কাছে কাজ্‌লা-দিদি কই?' বেশি কথা কী, যতীন্দ্রমোহন শুধু এ-দুটি কবিতার জন্যই বিশ্ব-সাহিত্যে অমর হয়ে থাকবেন।

নাটকীয় স্বগতোক্তি : নাট্যধর্মের সঙ্গে গীতিধর্মের সাযুজ্য ও নাটকীয় একোক্তির সহায়তায় চরিত্রের উপস্থাপনা, যতীন্দ্রমোহনের কবিতায় অনায়াস-সিদ্ধি লাভ করে। যেমন তাঁর 'বাঁশিওয়ালা' কবিতাটি—'ওগো বাঁশি-ওলা, এই বাড়ি এস—আধেক-জানালা ফাঁকে,/কোমল-মধুর কণ্ঠে ষোড়শী ডাকিল ফেরিওয়ালাকে;/অঙ্কে তাহার ফুটফুটে মেয়ে—তারি পানে বাহু মেলি—/তৃতীয়ার শশী আসিবে যেন সে আকাশের কোল ফেলি।'

চিত্রকল্প : যতীন্দ্রমোহনের কবিতায় ইমেজের জন্ম 'ইমাজিনেশন' থেকে। কবির সৌন্দর্যমুগ্ধ রোমান্টিক দৃষ্টিতে, তাঁর হৃদয়-ধর্মের সোচ্চার প্রকাশে, তাঁর জীবনানুরাগের গভীর প্রত্যয়ে সেই চিত্রকল্প অখন্ডতা লাভ করেছে। কবি-প্রকৃতির অতিচেতন ইন্দ্রিয়গ্রাম নানাদৃশ্য, ধ্বনি, স্পর্শ ও স্বাদের বৈচিত্র্যে যে বিভিন্ন চিত্রকল্প রচিত হয়, তার সমস্ত দৃষ্টান্ত যতীন্দ্রমোহনের কাব্যে উপস্থিত। যেমন :

দৃশ্য-চিত্র— 'ধূসর আকাশ-পটে তরঙ্গিয়া দিয়া ভ্রূ বঙ্কিম রেখা— .
অস্পষ্ট নক্ষত্রালোকে বাদুড়ের শ্রেণী ঊর্ধ্বে দিল দেখা।'
(সরোবরে সন্ধ্যা)

ধ্বনি-চিত্র— 'ঝিল্লির মঞ্জীর-মালা ঝিমি ঝিমি ঝিমি বাজে পায়ে পায়ে।'

ভাব-চিত্র— 'উদার মলয় নিঃস্ব আজি,/সামনে শুধু ধূসর বালুচর—
পঞ্চতপা দিক্ বিধবার/বসনখানি লুটছে নিরন্তর।
(দ্বি-প্রহরে)

ছন্দ : 'কথাকে তার জড়ধর্ম থেকে মুক্তি দেবার জন্যই ছন্দ। যতীন্দ্রমোহনের নিজস্ব ছন্দ ধ্বনিপ্রধান। 'শবরীর প্রতীক্ষা'য় পয়ার ছন্দ; 'দুর্যোধন', 'কর্ণ', 'অন্ধবধূ' বা 'দিদি-হারা' কবিতায় তাঁর ধ্বনি-প্রধান ছন্দের ব্যবহার সফলতা পেয়েছে।

৮. যতীন্দ্রমোহন · কবি ও কাব্য। অলোক রায়

সাময়িকের প্রভাব : 'পাঞ্চজন্য' কাব্যগ্রন্থের বহু কবিতায় সাময়িকের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। যেমন 'নিরুপায়' কবিতাটি : 'শ্রমিকের ফাটছে পিলে ধনিকের বুটের ঘায়ে/বণিকের বংশ বাড়ে তেতলা প্রাসাদ-ছায়ে;/কে খাটে, কেই খাটায়? কে বা কাল খেলায় কাটায়/যে বোনে গায়ের কাপড়, সে মরে আদুল গায়ে।'

রবীন্দ্র-প্রভাব : যতীন্দ্রমোহন মূলত রবীন্দ্রানুসারী কবি। তাঁর কবিতায় রবীন্দ্রনাথের কাব্যভাষা, উপমা, ছন্দ, রূপকল্প, চিত্রকল্প, স্তবক ও ভাববস্তুর প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। যতীন্দ্রমোহনের 'দেয়ালি' কবিতাটি রবীন্দ্রনাথের 'আগমন'—'কর্ণ' ও 'দুর্যোধন' কবিতা 'গান্ধারীর আবেদন' কবিতার সঙ্গে তুলনীয়। তাঁর মানবমুখিতা ও সৌন্দর্য-প্রিয়তার উৎস রবীন্দ্রকাব্য।

৭

জীবন-সায়াহ্নে : কালিদাস রায় লিখছেন, 'বৃদ্ধ বয়সে একদিকে ব্যাধির নিত্যযন্ত্রণা, তার উপর ছিল তাঁহার দেশবাসীর প্রতি দারুণ অভিমান ও ক্ষোভ। একদিন দেশের অধিবাসীরা তাঁহাকে যথেষ্ট মর্যাদা দান করিয়াছিল, পরে তাহারা তাঁহার যথাযোগ্য মর্যাদাদানে বিরত হইল ...।' জীবিতকালেই কবি তাঁর কাব্যগ্রন্থগুলির প্রতি প্রকাশক ও পাঠক-সমাজের উদাসীনতায় ব্যথিত হন। ১৩৪৩-এর ১৯ শ্রাবণ এক পত্রে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে লিখছেন : 'একটা কথা মনে রেখো, নতুনের ভিড়ের মধ্যে পুরাতন মাঝে-মাঝে অলক্ষ্য হয়ে আসে, এটা অনিবার্য। সকল সময় রসের টানেই পাঠক আকৃষ্ট হয় তা নয়, নতুনত্বের কৌতূহলের মোহ নতুন যুগের মন ভোলায়—অনেকে দ্বিতীয় পক্ষের বিবাহ করে, শ্রেষ্ঠত্বের তুলনা করে নয়, যেমন করে হোক স্বাদ বদলাবার লোভে। সাহিত্যেও তাই।'

দক্ষ শিল্পী এবং হৃদয়বান কবি—এই উভয় পরিচয়ে যতীন্দ্রমোহন বিশিষ্ট কবি। তাই তাঁর 'মিতা' যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের কবিতা দিয়েই তাঁকে বরণ করি—

'অনেক বন্ধু এসেছে তব অভিনন্দনে,—
তোমার গানের আনন্দ শুধু জাগিছে সবার মনে।

... ...

তোমার পথের ঝরা শেফালিরা এসেছিল আজ ভোরে,
বেলা হল যেই, মলিন মাধুরী আরবার গেল মরে।
চলে গেল তারা ভোরের তারার সাথে-সাথে হাত ধরি;
বলে গেল তারা, "বলো বন্ধুরে আজিও অঝরে ঝরি।" '

১ সেপ্টেম্বর ২০০১ — গোরা সিংহরায়

সূ চি প ত্র

নীহারিকা (১৩৩৪ বঙ্গাব্দ : ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দ)

মহাভারতী (১৩৪৩ বঙ্গাব্দ : ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দ)

পাঞ্চজন্য (১৩৪৮ বঙ্গাব্দ : ১৯৪১ খ্রিষ্টাব্দ)

আবাহন

ধ্বনিছে তোমার নাম আকুল অম্বরে—
হে মোর বসন্ত-লক্ষ্মি,—কলকণ্ঠস্বরে
ডাকাও পাপিয়া পিক হৃদয় নন্দনে,
ফুটাও মাধবীপুঞ্জ প্রিয়কুঞ্জবনে।
বিশ্বের বসন্ত আজি তোমারে ডাকিছে—
তুমি না আসিলে যদি বসন্ত তো মিছে!

তব গানে আম্রবীথি করিয়া আকুল
কৌতূহলে বাহিরিবে উন্মত্ত মুকুল।
বন-মল্লিকার বনে তব স্মিত হাসি
নিখিল ফুলের গন্ধ করিবে উদাসী।
ভিখারি বসন্ত আজি তোমারে ডাকিছে—
তুমি না আসিলে যদি বসন্ত তো মিছে!

কোকিল কূজিতে চাহে তোমার আহ্বান,
ভ্রমর গুঞ্জিতে চায় তব স্তবগান,—
রূপে রসে গন্ধে স্পর্শে শব্দে করি চুরি
ধরণী ছড়াতে চাহে তোমারি মাধুরি ;
তাই দশদিক আজি তোমারে মাগিছে—
তুমি না আসিলে যদি বসন্ত তো মিছে!

হাফিজের স্বপ্ন

অমা যামিনীর গহন আঁধারে চুপি চুপি এল প্রিয়া,
দ্বিগুণ আঁধার খর্জুর-বীথি, তাহারি আড়ালে দিয়া।
আঙুরের মতো অলকগুচ্ছে গোলাবের মালা পরি,
মৃদু উশীরের মদির গন্ধে নিশীথ আকাশ ভরি,

কাজল উজ্জল কালো কটাক্ষে হানিয়া বিজলি হাসি,
ফেরোজা রঙের বসন পরিয়া শিথানে দাঁড়াল আসি ;—
বীণানিন্দিত মধুর কণ্ঠে কহিল—রে অনুরাগি,
শূন্য শয়নে আমারে মাগিয়া জাগিয়া কিসের লাগি?
করুণা তাহার হৃদয়ে হানিল সুখের মতন ব্যথা,
জুড়ি জোড় পাণি বিগলিত বাণী, কষ্টে কহিনু কথা,—
তব অঞ্চল বসন্ত বায়ে হৃদয়ে যে ফুল ফুটে,
তব মঞ্জির সংগীতরবে হৃদয়ে যে ধ্বনি উঠে,—
তাহারি গন্ধে, তাহারি ছন্দে রচিয়া গজল গীতি
তোমারি কুঞ্জ দুয়ারে গাহিয়া শুনাইব নিতি নিতি ;
নাহি চাই খ্যাতি, যশে কাজ নাই, চাহিনাকো ধন মান,
তোমার স্তবের যোগ্য করিয়া শিখাইয়া দাও গান!

না কহিয়া কথা, না বলিয়া কিছু—লীলায়িত হেলাভরে
সেতারটি শুধু লইল টানিয়া কোমল বুকের 'পরে ;
অঙ্গুলি ঘাতে তারগুলি তার সংগীতে ভরি দিয়া
আমার কোলের সঙ্গীটি মোরে ফিরাইয়া দিল প্রিয়া!

গোলাবের কুঁড়ি তখনো ভাবেনি ফুটিতে হইবে কিনা,
ডানার মাঝারে মাথাটা গুঁজিয়া চাতকী চেতনাহীনা ;—
অমা যামিনীর গভীর আঁধারে মিলাইয়া গেল প্রিয়া—
শিশির-শীতল খর্জুর-বীথি, তাহারি ভিতর দিয়া!

তারপর হতে বাজিছে সাহানা সোহিনী সিন্ধু কাফি—
তারি সাথে সেই পরম পরশ উঠিতেছে কাঁপি কাঁপি ;—
তালে তালে উঠে দুলে দুলে তারি হৃদয়েবি আকুলতা,
সুরে সুরে সদা ঘুরে ঘুরে ফিরে তাহারি গোপন কথা!

জোনাকি

সূর্য গেল অস্তাচলে, দিগন্ত রেখায়
        স্বর্ণ আভা রাখি—
বাবলার শাখা হতে নমি তারি পায়
        কহিল জোনাকি ;—
তাপহীন তেজোরাশি হে রক্ত গোধূলি
        কহি মোর সাধ,—

আদর্শ তোমার আজি শিরে লব তুলি
কর আশীর্বাদ ;
তুমি যবে চলে যাবে, তব দীপ্তি সাথে
যাবে চলে দিন ;
আমি রব জাগি হেথা জ্বালাইয়া রাতে
দীপ্তি দাহহীন।
ক্ষুদ্র হই তবু এই জগতেরে আমি
বাসিয়াছি ভালো ;
যতটুকু সাধ্য আছে তাই দিব স্বামি—
ততোটুকু আলো।

আশা

ভাষায় কবে ভাবের কুঁড়ি ফুট্‌বে ফুলের মতন—
আশায় তারি আছি ;
অফুটন্ত অশোক-কুঞ্জে বীণাপাণির পায়ের
পরশ খানি যাচি।
বেণুর রন্ধ্রে বায়ুর মতন বাণীর সুধাবাণী
ফুট্‌বে আমায় কবে—
চিত্তকুহর পূর্ণ করে বাজ্‌বে বাঁশি আমার
উদার মধুর রবে?

নিভানো মোর জীবন দীপে জ্বল্‌বে কবে আলো
তারি আপন হাতে—
বিস্তৃত এ বিশ্বপুঁথির সকল লেখারেখা
উঠ্‌বে ফুটে যাতে?

প্রতীক্ষা

আমি শুনেছি সে প্রতি সাঁঝে সুদূর আকাশ মাঝে
মধুর বাঁশরি বাজে আমারে ডাকি ;—
তাই প্রতিদিন নিশাকালে সবকাজ দূরে ফেলে
মুক্ত জানালামূলে বসিয়া থাকি!

আমি জানি যে আমারে ডাকে সে হোথা চাহিয়া থাকে
উজল তারার ফাঁকে আঁখিটি রাখি—
তাই প্রতিদিন নিশাকালে সবকাজ দূরে ফেলে
মুক্ত জানালামূলে বসিয়া থাকি।
আমি শুনেছি এ মরদেশে চিরপরিচিত বেশে
সে কোন্ রজনী শেষে আসিবে নাকি—
আমি সেই আশা চোখে নিয়া অনিমেষ তাকাইয়া
মুক্ত জানালামূলে বসিয়া থাকি।
পাছে হেথা আসিবার কালে অজানা বেদনাজালে
কোথা ধরা পড়ে মোর হারান পাখি ;—
তাই প্রতিদিন নিশাকালে সব কাজ দূরে ফেলে
মুক্ত জানালামূলে বসিয়া থাকি।

আত্মীয়তা

মুখরা মেদিনী যবে মৌনী হয়ে আসে,
সন্ধ্যা অন্ধকার নামি বনান্তের পাশে
ধীরে ধীরে ঘিরে বিশ্ব তিমির অঞ্চলে,—
আঁখি মোর তারি তরে ভরি আসে জলে।

গুরু গুরু মেঘ গর্জে ধ্বনিত ধরণী,
ঝর ঝর ঝরে ধারা নিরন্তর-ধ্বনি,
তারি মাঝে কি ভাবিয়া—জানি না কেমনে
বারবার তার কথা কেন পড়ে মনে!

বুঝি না রহস্য-অন্ধ সন্ধ্যার কী মানে ;
বৃষ্টি কী বলিতে চায় তাই বা কে জানে?
শুধু জানি বৃষ্টি সাথে কেঁদে উঠে বুক!
সন্ধ্যা-অন্ধকার আর বর্ষা-বারিধার—
এরা কি মনের কথা আমার প্রিয়ার?

কবির গান

বাদরধারা ধরিয়া গেল, উঠিয়া কবি ধীরে
নগর ছাড়ি সুদূর মাঠে চলে,—
পুরব হতে গগন স্রোতে বহিল মৃদু বায়ু
বিছায়ে ছায়া শ্যামল তৃণদলে।
বিজনে একা বসিয়া কবি কণ্ঠ দিল ছাড়ি—
মধুর ধ্বনি ছাড়িয়া ধরা চলে ;
মেঘের পথে হাঁসের শ্রেণী চকিতে গেল থেমে,
পাপিয়া লুটি পড়িল পদতলে!

অলির পিছে ফিরিছে ফিঙে, থামিল স্বর শুনি,
লুকাল ফণী কেতকী তরুমূলে ;
শিকার হানি নখরতলে চঞ্চু গুঁজি বুকে—
ক্ষুধিত বাজ আহার গেল ভুলে!
কোকিল ভাবে গেয়েছি আমি কত না শত গান.
এমন মধু কেমন করে হবে?
এ যেন গাহে নূতন গীতি নূতন জগতের—
মোদের ধরা ফুরায়ে যাবে যবে!

টেনিসন

গৃহিণীহীন শ্বশুরালয়ে

শ্যালীসভায়

আমি হাস্‌তে চাই তো তোদের মতন
পরান খুলে সই,—
ভালো বাস্‌তে চাই তো তোদের মতন
কিন্তু পারি কই?
তোদের সুখে, তোদের ব্যথায়,
গল্পে গানে হাসির কথায়,
সকল কথা ভুলায়, শুধু
একটি কথা বই ;—
আমি তাইতে এমন হাসির হাটে
উদাস হয়ে রই!

তোমরা ভাবৃছ, কচ্চি এত—
সত্যি কথা সই,
কোচ্চ এত—সত্যি, আমি
অস্বীকার তো নই,
কিন্তু যাহার চোখের দেখা
সকল করা কোন্তু একা,
সেই পাগল করা পরশমণি
আজকে হেথা কই?
তারই কথা জাগ্‌ছে মনে,—
তাইকে এমন হই!

আমি তোদের মতন পরান খুলে
হাস্‌তে চাই তো সই—
আমি তোদের মতন আপন ভুলে,
মিশ্‌তে চাই তো ওই!
তোদের সুখে দুঃখে ব্যথায়,
রঙ্গে রসে হাসির কথায়,
সকল কথা ভুলায়, শুধু
একটি কথা বই;—
আমি তাইতে তোদের হাসির হাটে
নীরব হয়ে রই!

কালো আঁখি

কালো আঁখি তব, সখি, সরসীর জল;
অতল অপরিমেয় প্রশান্ত নির্মল
শোভা তার;—তটশোভা, শ্যাম কুঞ্জবন,
উদার আকাশ পট বিম্বিত যেমন
সরসীর স্বচ্ছ বারিমাঝে—ওগো প্রিয়ে,
তেমনি সুন্দর শোভা রয়েছে ফুটিয়ে
তোমার নয়ন মাঝে; স্নেহ, ভালোবাসা,
মৌনলজ্জা, প্রীতি, দয়া—হৃদয়ের ভাষা!

প্রেমের প্রবেশ

প্রেম প্রবেশিল জানালার পথে,
 ধন প্রবেশিল দ্বারে ;
ধনেরে দেখিয়া আসিয়াছ বুঝি?
 শুধালাম আমি তারে।
প্রেম পাখা নাড়ি কহিল কাঁদিয়া
 করুণ মধুর স্বরে,—
গরিবের গৃহে যেমন আমার,
 তেমনি ধনীর ঘরে!

ধন বাহিরিল জানালার পথে,
 দারিদ্র্য ঢুকিল দ্বারে ;
ধনের সঙ্গে যাবেন এবার?
 শুধালাম আমি তারে।
প্রেম পাখা নাড়ি কহিল কাঁদিয়া—
 মিথ্যা কহিছ কেন?
ধন—সে তোমারে ছাড়িল বলিয়া
 আমি আরো কাছে জেনো!

টেনিসন

দিদি-হারা

বাঁশবাগানের মাথার উপর চাঁদ উঠেছে ওই—
মাগো, আমার শোলক-বলা কাজ্‌লা দিদি কই?
পুকুর ধারে, নেবুর তলে থোকায় থোকায় জোনাই জ্বলে,-
ফুলের গন্ধে ঘুম আসে না, একলা জেগে রই ;
মাগো, আমার কোলের কাছে কাজ্‌লা দিদি কই?

সে দিন হতে দিদিকে আর কেনই বা না ডাকো,
দিদির কথায় আঁচল দিয়ে মুখটি কেন ঢাকো?
খাবার খেতে আমি যখন দিদি বলে ডাকি তখন,
ওঘর থেকে কেন মা আর দিদি আসেনাকো,
আমি ডাকি,—তুমি কেন চুপ্‌টি করে থাকো?

বল্ মা দিদি কোথায় গেছে, আস্‌বে আবার কবে?
কাল যে আমার নতুন ঘরে পুতুল বিয়ে হবে!
দিদির মতন ফাঁকি দিয়ে আমিও যদি লুকোই গিয়ে—
তুমি তখন একলা ঘরে কেমন করে রবে?
আমিও নাই, দিদিও নাই—কেমন মজা হবে!

ভুঁইচাঁপাতে ভরে গেছে শিউলি গাছের তল,
মাড়াস্ নে মা পুকুর থেকে আন্‌বি যখন জল;
ডালিম গাছের ডালের ফাঁকে বুলবুলিটি লুকিয়ে থাকে,
উড়িয়ে তুমি দিয়ো না মা ছিঁড়তে গিয়ে ফল;—
দিদি এসে শুনবে যখন, বল্‌বে কী মা বল্!

বাঁশবাগানের মাথার উপর চাঁদ উঠেছে ওই—
এমন সময়, মাগো, আমার কাজ্‌লা দিদি কই?
বেড়ার ধারে পুকুর পাড়ে ঝিঁঝি ডাকে ঝোপে ঝাড়ে;
নেবুর গন্ধে ঘুম আসে না—তাইতো জেগে রই;—
রাত হল যে, মাগো, আমার কাজ্‌লা দিদি কই?

শরতের আবাহন

ওরে প্রবাসি, তোর প্রবাসের কাজ
তাড়াতাড়ি সেরে নে—
ওই দেখ্—তোর গৃহের দুয়ারে
আসিয়া দাঁড়াল কে!
স্নেহকম্পিত পুরাতন স্বরে,
ডাকিয়া তোদের বারবার করে,
বরষের পরে, ফিরে তোর দ্বারে
আসিয়া দাঁড়াল কে!
তোর প্রবাসের কাজ
তাড়াতাড়ি সেরে নে।
গলিত-স্বর্ণ-রঞ্জিত-বাস
মণ্ডিত চারু কায়,
চরণ ফেলিতে শত শতদল
ফুটে উঠে পায় পায়;

শুভ্র সুহাস শান্ত অধরে,
মোহন সুষমা অঙ্গে না ধরে—
বরষের পরে, আজি তোর দ্বারে
হাসিয়া দাঁড়াল কে!
* * * প্রবাসের কাজ
তাড়াতাড়ি সেরে নে।

আকাশ তাহারি মাধুরি মাখিয়া
হাসিছে হরষ রসে ;
নিশ্বাসে তার বিশ্ব শিহরে
পুলক-রস-পরশে ;
শেফালির মালা জড়াইয়া কেশে,
ললিত রাগিণী গাহি উল্লাসে,
বৎসর শেষে, সুধাহাসি হেসে
কে ওই আসিল রে!
* * * * কাজ
তাড়াতাড়ি সেরে নে।

শরৎ তোদের ডাকিতে এসেছে—
আয়রে ফিরিয়া ঘরে ;
শত ম্লান আঁখি চেয়ে আছে যেথা
কত আগ্রহ ভরে ;
পিতার শান্তি, মাতার তৃপ্তি,
ভগিনী ভ্রাতার হরষদীপ্তি,—
গৃহের শরৎ-লক্ষ্মী যেথায়
দুয়ারে দাঁড়ায়ে রে!
* * * * *
তাড়াতাড়ি সেরে নে।
ওরে প্রবাসি, তোর প্রবাসের কাজ
তাড়াতাড়ি সেরে নে।

তবু

ভৈরবী—একতাল

খেলিতে হবে এ খেলা—
তবু খেলিতে হবে এ খেলা!

ভাঙিয়ে গিয়েছে জীবনের হাট, ফুরিয়ে গিয়েছে মেলা।
পরের নয়ন ভুলাবার লাগি
এ যেন হয়েছে নিশি নিশি জাগি,
মরম মাঝারে বেদনা লুকায়ে নয়ন মুছিয়ে ফেলা!
সঙ্গী যে ছিল এক এক করে
গিয়েছে ফিরিয়ে যে যাহার ঘরে—
কখন্ যে মোর আকাশের 'পরে গড়িয়ে গিয়েছে বেলা ;
শুধু আপনারে নিয়ে প্রাণপণে খেলিতে হইবে খেলা—
তবু খেলিতে হবে এ খেলা।

জেলের মেয়ে

ভুট্টো ক্ষেতের পাশে মোদের ছোট্ট কুটিরখানি ;
শিয়র দিয়ে যাচ্চে বেয়ে ময়না গাঙের পানি—
একেবারে আমাদের ওই মাদার গাছের তলে ;
গাছের ছায়া আধেক ডাঙায়, আধেক পড়ে জলে।

বাবা আমার মস্ত জেলে ময়না গাঙের তীরে—
সাঁঝে বেরোয় নৌকো নিয়ে, পোঁহাত হলে ফিরে।
পাড়ায় যত জেলে আছে, সকল জেলের চেয়ে
বাবা আমার ভারি লায়েক—'পঞ্চ নায়ের' নেয়ে।

গোলা ভরা ধানের রাশি, পালা ভরা খড়—
আসুক্‌নাকো কী করবে সে কাল-বোশেখের ঝড়?
দুটো কৃষান চরায় মাঠে দশটা বলদ গাই ;
খাওয়া-পরার জন্যে মোদের ভাবনা কিছু নাই।

তবু আমার বুকের মাঝে কেমন করে যেন—
বুঝতে নারি, বলতে নারি—এমন করে কেন!
ইচ্ছা করে দৈবে আমি হতাম যদি ছেলে,
কবে কোথায় যেতাম চলে ঘরের খেলা ফেলে!

দিনের বেলায় বসি যখন মাদার গাছের তলে,
কত রকম লতাপাতা যায় যে ভেসে জলে ;
ভেসে ভেসে কোথায় যাবে ঠিকানা তার নাই—
ইচ্ছা করে—ওদের সাথে কোথায় ভেসে যাই!

ব্যথার ব্যথী নাইকো পাশে—নাইকো সঙ্গী-সাথ,
একা একা যায় কি থাকা সকাল থেকে রাত?
ইচ্ছা করে চুপটি করে কোথায় চলে যাই—
কত নদীর বাঁকে বাঁকে, কত নূতন ঠাঁই।

—নিঝুম রাতে বাবার সাথে কত না বাই জাল,
বাবাকে দিই বসিয়ে দাঁড়ে—আমি ধরি হাল ;
ঝড়ের মাঝে সামাল সামাল নৌকো দিয়ে পাড়ি
ভোর না হতে আস্‌ব চলে আবার ফিরে বাড়ি।

কালো জলের কল্‌কলানি, ফেনা সমুদ্দুরের,
জলের উপর লুকোচুরি মেঘের ও রোদ্দুরের ;
ভাদর মাসের ভরা গাঙে ভাসিয়ে দিয়ে ভেলা,
বসে বসে দেখি কেমন কালো জলের খেলা!

তা না হয়ে কোথায় হতে হলাম কি না মেয়ে—
বয়স কাটে ঘরের মাঝে শুয়ে এবং খেয়ে,
কাপড় কেচে বাসন মেজে জালের দড়ি বুনে
সারাটা দিন একলা বসে প্রহর গুনে গুনে!

সূয্যি ডোবে, বাবা বেরোয় জালের পালা নিয়ে,
আঁধার ঘরে কপাট আঁটি একলা মায়ে ঝিয়ে
বাঁশের মাচায় কাঁথার উপর এলিয়ে দিয়ে গা—
চোখটি বোজার আগেই আমার ঘুমিয়ে পড়ে মা।

আঁধার ঘরের আঁধার তখন ঘনিয়ে আসে আরো,
ঝাঁ ঝাঁ করে রাতের আকাশ—সাড়াটি নাই কারো।
বুকের কাছে উঠে পড়ে ভরা গাঙের ঢেউ—
মায়ের কাছে শুয়ে ভাবি নাইকো আমার কেউ!

হাহা করে হাওয়া ডাকে কপাট নাড়া দিয়ে
আমায় বুঝি ডাক্‌ছে ভেবে দুয়োর খুলি গিয়ে ;
হি হি করে পালায় হাওয়া উড়িয়ে দিয়ে অলক—
সারা রাতের ভিতরে আর পড়ে না মোর পলক।

দিনে রাতে বুকের মাঝে কেমন করে যেন—
বুঝ্‌তে নারি বল্‌তে নারি—এমন করে কেন।
গাঙের চরে চেঁচিয়ে মরে রাতের যত পাখি—
আমার চোখে ঘুম আসে না—একলা জেগে থাকি!

শিশু-রহস্য

কহিতে জানে না কথা—মুখে ভাঙা ভাষ,
চলিতে পারে না, সদা চলিবার আশ ;
হাসি কি জানে না, মুখে হাসি আছে ফুটে,
কান্না অর্থহীন, চুম্বনেতে কেঁদে উঠে ;
ভাবুক নহেকো তবু খেয়ালেতে আছে,
আকাশের চাঁদেরে সে মিতা করিয়াছে ;
ভালো মন্দ নাহি বুঝে, যা পায় তা খায়
মায়ে মারে, তবু ফিরে মারই কাছে যায় ;
রাত দিন ধুলো মাখে তবুও সুন্দর,
হাসিতে ফুটিয়া উঠে কলিকা কুন্দর ;
ধর্মের ধারে না ধার—কৃষ্ণ কিংবা যিশু,
লজ্জাহীন নগ্নকায় অধার্মিক শিশু!
সর্বলোক-শিশু-পিতা বিধাতার বরে,
অকলঙ্ক শিশুবেশে মানবের ঘরে!

বিশ্বপ্রাণ

কে বলে ধরণী জড় নির্জীব নীরব?
প্রতিক্ষণে উঠে যার রহস্য-উৎসব
জলে স্থলে শূন্যে শৈলে ফুলে ফলে গাছে—
এ বিশ্ব-অন্তর-বাসী যে জীবন আছে!
অহোরাত্রি সিন্ধুবক্ষে যে তরঙ্গ উঠে,
ফল হয়ে ফলে যাহা, ফুল হয়ে ফুটে,
অন্ধকারে কাঁদে যাহা, চন্দ্রাকারে হাসে,
হাহাকারে দহে যাহা সাহারার শ্বাসে,
বায়ুরূপে বহে যাহা, মেঘ হয়ে ডাকে ;
যে গুঞ্জন উঠে নিত্য বিশ্ব-মধুচাকে,
অনন্ত চেতনাপূর্ণ মহা আয়োজন—
এ যদি না হয়, বল কী তবে জীবন?
প্রভাত না হতে হতে পড়ে যায় বেলা—
জীবন যাহারে বলি—সে তো শুধু খেলা!

রথ

কাননের কোলে শ্যামল কোমল পথটি—
তাহারি উপরে চলিয়াছে ধীরে রথটি।
সমুখে সুদূরে উদিছে প্রভাত রবি,
হাসিছে জগৎ মধুর সোনালি ছবি,
পথ তরুসারি ভরিয়া রয়েছে ফুলে,
শাখায় শাখায় দোয়েল পাপিয়া বুলে ;
নব উৎসাহে চলেছে নূতন রথটি—
শান্ত সরল আলোক উজল পথটি!

নগরের মাঝে রক্ত-পাটল পথটি—
তারি 'পর দিয়া ছুটিয়া চলেছে রথটি।
মাথার উপরে জ্বলিছে প্রখর রবি,
ধুলায় ধূসর পিঙ্গ জগৎ ছবি,
পথ ঘাট বাট মানুষে মানুষে ভরা—
কলকোলাহলে কাঁপিয়া উঠিছে ধরা।
অধীর আবেগে চলেছে ছুটিয়া রথটি—
ঘুরিয়া ফিরিয়া চলিয়াছে বাঁকা পথটি!

সাগরের কূলে বালুকাধূসর পথটি—
তারি 'পরে এসে থামিয়া আসিল রথটি।
অস্ত অচলে ডুবিছে ক্লান্ত রবি,
মৌন বিষাদে জগৎ তামসী-ছবি,
প্রান্তর-পথে নাহি চলে জনপ্রাণী,
নিভৃত আকাশে ধ্বনিছে ঘুমের বাণী ;
মন্থর গতি থামিল জীর্ণ রথটি—
সাগরে আসিয়া মিলাইয়া গেল পথটি!

খাঁটি সত্য

আমার প্রিয়ার নয়ন নহেকো
    হরিনীর চেয়ে ভালো,
আঁখিতারা তার কালো বটে, নয়
    ভ্রমরের চেয়ে কালো।
চঞ্চল আঁখি ইঙ্গিতে কভু
    খঞ্জন নাহি নাচে,

বেণীর তুলনা শুনিয়া নাগিনী
লাজে না লুকায়ে বাঁচে।
মুখখানি দেখে চাঁদ বলে কারো
ভুলেও হয় না ভুল,
দন্তরুচির কান্তি লভিতে
ফোটে না কুন্দ ফুল।
মধুর অধরে মধু আছে, তবু
ভ্রমর নাহিকো ভুলে,
কালো মেঘ ভেবে আকাশের তারা
ফুটিতে আসে না চুলে!
পাগল নহিলে বলিবে না কেউ
কথায় অমিয়া ঝরে,
হাসির সহিত তুলনা হেরিয়া
জোছনা হাসিয়া মরে!
চারু চরণের নূপুর শিখিতে
হংসী চাহে না ফিরে,
চরণ ফেলিতে কোন বনফুল
ফোটে না চরণ ঘিরে!
চরণ-কমল শুনিয়া কমল
রাগে রাঙা হয়ে ফুটে,
তনুলতা সাথে তুলনা শুনিয়া
লতিকা শিহরি উঠে!
রং যে তাহার কত সুন্দর
শতবার তাহা জানি,—
তাই বলে সে যে 'দুধে-আলতায়',
—সে কথা কেমনে মানি?
মিথ্যা মায়ায় সাজাইতে তারে
নাই কোনো প্রয়োজন,
সকলের চেয়ে সত্য সে মোর
যাহারে সঁপেছি মন।

প্রদীপ

এ নহে বিলাসদৃপ্ত ধনীর আগারে
বিচিত্র স্ফটিক পাত্রে দীপ্ত দীপমালা।
শত বিদ্যুতের দ্যুতি শত আলো-জ্বালা-

প্রমোদ-উৎসব-গৃহে চারু-তারাহারে
জ্বলে না ইহার জ্যোতি ঝলসি নয়ন—
বিলাস-লালসা-পুষ্ট ভোগ-হুতাশন!
অন্ধকার গৃহকোণে স্নিগ্ধোজ্জ্বল লিখা
এ যে দরিদ্রের দীপ নিশীথতামসে—
নিত্য নিশি জাগি রহে মৌন নির্নিমেষে,
প্রজ্জ্বলিত প্রদীপের পুণ্য বহ্নি-শিখা ;
জননী লক্ষ্মীর মতো জাগ্রত নয়নে
আগুলি সন্তানগণে অশ্রান্ত যতনে!
দারিদ্র্যের দগ্ধ ভালে কল্যাণের টিপ—
অন্ধকারে বদ্ধগৃহে সুমঙ্গল দীপ!

ক্ষ্যাপা

(বাউল)

ওরে ক্ষ্যাপা, যদি প্রাণ দিতে চাস্—
এই বেলা তুই দিয়ে দে না ;
ওরে, মানের তরে প্রাণটি দেবার
এমন সুযোগ আর হবে না!
যখন, দু-দিন আগে দু-দিন পরে—
তফাৎ মাত্র এই,
তখন অমূল্য এই মানবজীবন
বৃথায় দিতে নেই—
(ওরে ক্ষ্যাপা)

মায়ের দেওয়া এ ছার জনম
দে রে মায়ের তরে ;
অমর জনম পাবিরে ভাই
জগৎ-মায়ের ঘরে।
কি দিয়েছিস্—লিখ্‌বে যখন
পরকালের খাতা,
তখন, তোরই দানে কর্‌বে আলো
বইয়ের প্রথম পাতা!—
(ওরে ক্ষ্যাপা)

মরণ

সেদিন দুর্যোগ রাত্রে আমার এ বাতায়নে
মরণ মেলিয়া দিল পাখা ;—
বিপুল ছায়াটি তার পড়িল এ গৃহাঙ্গনে
পাতালের কালো মসী মাখা!
পাখার ঝাপটে তার সমস্ত আকাশ জুড়ি
হাহাকার উঠিল ধ্বনিয়া—
অস্ফুট গম্ভীর শব্দে নিশাচর গেল উড়ি
কক্ষে কক্ষে দীপ নিভাইয়া!

কতদিন গেছে চলি ; প্রভাত আসি আবার
জাগায়েছে ঘুমন্ত জগতে ;
একখানি নিদ্রা, হায়, শুধু ভাঙে নাই আর
দিবাদীপ্ত চেতনার পথে।
আবার উঠেছে জ্বলি নিভানো প্রদীপগুলি
গোধূলির তারকার সাথে—
একখানি তারি মাঝে জ্বলিতে গিয়াছে ভুলি
অদৃষ্টের অঞ্চল আঘাতে!

গেল যে, সে গেল বেঁচে, পড়ে যে রহিল পিছে,
পলে পলে তারি তো মরণ ;—
চিরদিন তারে চেয়ে কাঁদিতে হইবে মিছে,
—এই নিয়ে মানব জীবন!
চঞ্চল প্রাণ-তরঙ্গ অশ্রান্ত বহিয়া চলে
আবর্তিত লক্ষ সুখে দুখে—
একদিন আসে মৌন সে অশান্ত কোলাহলে,
মরণের শিলা হিম-বুকে!

অশান্ত ঝটিকা শেষে একদিন আসে শান্তি
ক্লান্তি শেষে আসে সে আরাম ;
দূর করে জীবনের যত কিছু ভুল ভ্রান্তি
মরণের মহা পরিণাম!
স্বপ্ন শেষে জাগরণ, অন্ধকার শেষে আলো,
সংক্ষুব্ধ সাগর শেষে বেলা ;—
সেই দিন হয় শেষ যত কিছু মন্দ-ভালো
—ফুরায় এ জীবনের খেলা!

রেখা

হৃদয়-চেরা রক্তে আজি আঁকিনু রেখা যতনে
তোমারি পায়ে পরায়ে দিতে আলতা ;
জানি না সেকি যোগ্য হবে রক্ত-জবা চরণে,
যদিও মাগো জবারি মতো লাল তা।
হোক্ না হোক্ তোমারি সে তো, কোথায় পাব অধিক আর,
তোমারি সে যে, হোক্ না ভালো মন্দ ;
কুঞ্জে ফুটে পুষ্প—আছে সবারি পূজা অধিকার,
যদিও নাহি সবারি মধু গন্ধ।
আকাশে মাঠে, কাননে ঘাটে, গোধূলি মেঘ-স্বর্ণে
ছড়ানো তব সুষমা অফুরন্ত ;
তোমারি দেওয়া নয়ন-তুলি ডুবায়ে তারি বর্ণে
আঁকিল রেখা কল্পনা দুরন্ত!
জগৎজোড়া নয়ন তব রয়েছে চাহি দিবারাত,
যে চোখে কভু এড়ায়নাকো তিলটি ;
কালের কালো কষ্টি 'পরে কষিয়া লয়ে রেখাপাত
বুঝিবে তুমি সোনা কি শুধু গিলটি।

গোধূলি

ছায়া-ঝিকিমিকি স্বর্ণ আলোক আমি
সন্ধ্যা-রবির কিরণের অনুগামী,
প্রদোষ-নীরবে ধীরে ধীরে আমি নামি—
গোধূলি আমার নাম
পাখিদের আমি কুলায়ে ভুলায়ে আনি,
হাওয়ায় বহাই ফুলের সুরভিখানি,
ক্লান্ত গাভীরে গৃহপানে আমি টানি—
বিশ্রাম অভিরাম।

সন্ধ্যার তারা মোরে হেরি তবে ফুটে,
আরতি শঙ্খ মোরি সাথে বেজে উঠে,
দিনের ক্লান্তি আদেশে আমার টুটে
লভিতে শান্তি-ক্রোড় ;
গৃহদীপখানি আমারে হেরিয়া জ্বলে,
বিরাম শয়ন রচি বাতায়ন তলে,
বিছাই তন্দ্রা ধরণীর স্থলে জলে
স্বপ্ন-পরশে মোর।

অথচ আমার ক্ষণিকের পরমায়ু ;
প্রদোষ বাতাসে তাই কাঁদে মোর বায়ু ;
দিয়ে যাই তবু যতটুকু আছে আয়ু
ধরার সুখের লাগি ;
দিনে দিয়া ছুটি, রাত্রিরে ডেকে আনি,
শ্রান্তির পর শ্রান্তির রেখা টানি,
সন্ধ্যার বায়ে রটায়ে বিরাম বাণী
তার পরে ছুটি মাগি।

অস্তরবির হিরণ কিরণাসীনা,
সন্ধ্যার মেঘে চঞ্চলালোকলীনা,
দূর দিগন্তে বাজাই স্বর্ণ বীণা—
তন্দ্রা-বিছানো তান ;
দিকে দিকে মেলি চঞ্চল কম-কায়া,
তালের বাকলে রচিয়া সোনার মায়া,
জাহ্নবী-জলে বিছায়ে রক্ত ছায়া—
তবে মোর অবসান।

জ্যোৎস্না-লক্ষ্মী

তুমি লুকিয়ে বেড়াও যে মুখখানি, দেখেছি কাল রাতে-
আমার পদ্মাচরের ভাঙা ঘরের শূন্য আঙিনাতে।
সে যে কত রাতের বিফল জাগা সফল করে দিয়ে
শেষে কালকে আমার চোখের ফাঁদে পড়লে ধরা প্রিয়ে!
তখন নিঝুম রাতি, সুপ্ত সবাই রুদ্ধ দুয়ার ঘরে,
ভিজে শ্যাওলা-নীড়ে ঘুমায় মরাল, চখা ঘুমায় চরে ;
কেবল বুনো ঝাউয়ের বনে বেড়ায় ব্যস্ত-ব্যাকুল বায়,

আর আমি ছিলাম জেগে আমার ঘরের জানালায়।
তুমি শিশির-ভেজা কাশের বনে বিছিয়ে দিয়ে আঁচল,
সিত জ্যোৎস্নামাখা হাঁসের পাখায় এলিয়ে দিয়ে কাঁচল
সাদা ঝিনুক-পাতা বালির তটে ঘুমিয়েছিলে রানী—
আমার মুগ্ধ নয়ন হেরেছিল সুপ্ত সে রূপখানি।
তোমার এতকালের গোপন শোভা পড়ল ধরা যাতে,
কাল রাত দুপুরে পদ্মাচরে শরৎ-পূর্ণিমাতে!
আমি বলব আরো চিহ্ন কী কী তোমার গায়ে আছে?
আমি বলতে পারি, ভাবছি কেবল রাগ কর বা পাছে!
তোমার গত রাতের যত কথা প্রকাশ করে দিয়ে
পাছে বঞ্চিত হই চির-জনম প্রসাদ হতে প্রিয়ে!
তবু এটুক্ আমি বলব, তুমি রাগ কোরো না তাতে—
তোমার লুকিয়ে-রাখা মুখখানিকে দেখেছি কাল রাতে।

আবেশ

যে দিন সবে সন্ধ্যা নামে দিনের অবসরে,
আস্‌ছে ছেয়ে আঁধার পাতা দিনের আঁখি 'পরে—
        কর্মহীনের যা কিছু কাজ,
        সজ্জাহীনের যা কিছু সাজ
সাঙ্গ করে বসে আছি সঙ্গীবিহীন ঘরে—
সে দিন যবে সন্ধ্যা নামে দিনের অবসরে।

সবে তখন ফাগুন শেষে প্রথম লঘু বায়—
পথের 'পরে ছিলাম চেয়ে ঘরের জানালায়।
        পথিক চলে আপন পথে—
        তারি মাঝে কোথায় হতে
পাখির মতন আঁখিটি তার লুটিয়ে প'ল পায়—
আমি তখন ছিলাম আমার ঘরের জানালায়।

ওরে সাঁঝের কুলায়হারা, ওরে নয়ন-পাখি—
ভাব্‌ছি বসে কোথায় তোরে কেমন করে রাখি!
        জানি না কী আবেশভরে
        নিলাম টানি বুকের 'পরে,
হৃদয়তলে রাখ্‌ব বলে আঁচল দিয়ে ঢাকি ;—
ওরে আমার কুলায়হারা, ওরে করুণ আঁখি!

শিশুর বাণিজ্য

আমার খোকার নৌকাখানির দাম সে লক্ষটাকা—
ঝিনুক-নায়ে পাল তোলা তার প্রজাপতির পাখা ;
চাঁপার কলি দাঁড় ক-খানি, অপ্‌রাজিতার হাল,
মাস্তুলটি সদ্য গড়া পদ্মফুলের নাল!
কোথায় যাবে সোনার খোকা—বাণিজ্যি কর্‌তে—
দেশবিদেশের মুক্তো এনে বেসাতি ভর্‌তে!

আমার খুকির গাড়িখানির দাম সে লক্ষটাকা—
ইঁদুর ছানার সাদা জুড়ি, কদম ফুলের চাকা ;
গাঁদা ফুলের গদিটি তার, ধুতরো ফুলের ছই,
ঝুমকো ফুলের ঝালর ঝোলে ছইয়ের 'পরে ওই!
কোথায় যাবে সোনার খুকি—বাণিজ্যি কর্‌তে—
দেশবিদেশের রত্ন এনে পশরা ভর্‌তে!

যা রে সোনার খোকাখুকি বাজার লুটে আনি
রাজার মতন সাজা তোদের নিজের গৃহখানি।
দু-হাত দিয়ে বিলিয়ে দিলেও তোদের আনা ধন,
লক্ষগুণে বাড়বে ছাড়া কম্‌বে না কখন।
জ্ঞান-ই তোদের মুক্তোমানিক, ধর্ম তোদের হীরে—
সকল রতন চেয়ে যতন করিস্‌ এ দুটিরে।

শেষ কথা

সময় হল বিদায় নেবার,
তরী আমার তীরে ;
শেষ করে যাই তবে আমার
শেষের কথাটি রে।

আমায় যারা দিয়েছ দুখ—
তাদের দিনু হাসি,
যারা আমায় দিয়েছ সুখ,
তাদের অশ্রুরাশি!

দুখটি যা—তা নিলাম সাথে
চিরদিনের তরে,

সুখ যা—দিলাম সবার হাতে—
আপনা এবং পরে।

শুরু হল যাত্রা এবার,
ভাস্‌ল নৌকা নীরে—
শেষ করেছি এবার আমার
শেষের কথাটিরে।

খেলা

সিন্ধুতীরে খেলে শিশু বালি নিয়ে খেলা ;
রচি গৃহ, হাসিমুখে ফিরে সন্ধ্যাবেলা
জননীর অঙ্ক 'পরে। প্রাতে ফিরে আসি
হেরে—তার গৃহখানি কোথা গেছে ভাসি!
আবার গড়িতে বসে—সেই তার খেলা,
ভাঙা আর গড়া নিয়ে কাটে তার বেলা।
এ যে খেলা—হায়, এর আছে কিছু মানে?
যে-জন খেলায় খেলা—সেই বুঝি জানে!

জন্মভূমি

ওই যে গাঁটি যাচ্ছে দেখা 'আইরি' ক্ষেতের আড়ে-
প্রান্তটি যার আঁধার করা সবুজ কেয়াঝাড়ে,
পুবের দিকে আম-কাঁঠালের বাগান দিয়ে ঘেরা,
জট্‌লা করে যাহার তলে রাখাল বালকেরা—
ওইটি আমার গ্রাম, আমার স্বর্গপুরী
ওইখানেতে হৃদয় আমার গেছে চুরি!

বাঁশবাগানের পাশটি দিয়ে পাড়ার পথটি বাঁকা,
পথের ধারে গলাগলি সজ্‌নে গাছের শাখা,
গোরুর গাড়ির চাকায় পথে শুকায়নাকো কাদা,
কোথাও বা তার বেড়ার পাশে ঘুঁটে ছায়ের গাদা ;-
তবু আমার জন্মভূমি স্বর্গপুরী,
বিশ্বশোভা ওইখানেতে গেছে চুরি!

যত দেশের যত পাখি ওই গাঁয়ে কি আছে!
ঝোপে-ঝাড়ে বেড়ায় উড়ে বাসার কাছে কাছে ;
পথের পাশে গাছের ডগা নুইয়ে পড়ে গায়ে,
চল্‌তে গেলেই শুক্‌নো পাতা গুঁড়োয় পায়ে পায়ে ;-
বনে-ভরা এমনি আমার স্বর্ণপুরী,
তবু আমার চিত্ত সেথায় গেছে চুরি!

পদ্মদীঘি কোথায় পাব—পদ্ম নাইকো মোটে,
চৈৎ-বোশেখে শুকিয়ে উঠে, জলটুকু না জোটে।
পানায়-মরা ডোবায় ভরা, সিদ্ধি গাছে ছাওয়া,
ভাঁট্‌-পিঠিলির জঙ্গলেতে হাঁপিয়ে বেড়ায় হাওয়া—
এমনি আমার স্বর্ণছাড়া স্বর্গপুরী,
স্বর্গশোভা তবু সেথায় গেছে চুরি।

পাঠশালাটিও নাইকো গাঁয়ে—নাইকো সে ডাকঘর,
কোথায় বদ্দি, যদিও কম্‌তি নয়কো বড় জ্বর ;
রাজার প্রাসাদ নাইকো সেথা, ধনীর দেবালয়,
সজ্জাহীনের লজ্জা নাইকো, দারিদ্র্যে নাই ভয় ;—
সৃষ্টিছাড়া এমনি আমার স্বর্গপুরী,
সকল অভাব তবু সেথায় গেছে চুরি!

তবু ওঠে কুমোর পাড়ায় কদমতলায় ধারে
সঙ্কীর্তনের মিলন-গীতি সান্ধ্য অন্ধকারে,
সবাই যেন স্বাধীন সুখী, বাধা-বাঁধন-হারা—
আবাদ করে বিবাদ করে সুবাদ করে তারা ;
এমনি আমার সাদাসিধে স্বর্গপুরী,
তাইতো আমার মনটি সেথায় গেছে চুরি!

শোভা বল, স্বাস্থ্য বল—আছে যা না আছে,
বুকটি তবু নেচে ওঠে এলে গাঁয়ের কাছে ;
ওইখানেতে সকল শান্তি, আমার সকল সুখ—
বাপের স্নেহ, মায়ের আদর, প্রিয়ার হাসি মুখ ;
তাইতো আমার জন্মভূমি স্বর্গপুরী,
যেথায় আমার হৃদয়খানি গেছে চুরি?

মিলন

কাল রজনীতে উঠে নাই চাঁদ, ফুটেনি একটি তারা,
বিরহী বাতাস আঁধারের মাঝে হয়েছিল দিশাহারা ;
জোনাকি জ্বলেনি যূথি-মালঞ্চে, ঝিঁঝিটি ডাকেনি ঝাড়ে,
টিটিপাখি শুধু টিট্‌কারি দিয়া কেঁদেছে দীঘির পাড়ে ;
তারি মাঝে আমি ইমন-বেহাগে সেধেছিনু বাঁশিখানি—
কেহ না শুনুক্ তুমি শুনেছিলে, আমি তাহা মনে জানি!

আজ রাতে যবে ঝর-ঝর ধারে বাদর ঝরিছে মেঘে,
হরষ-সরস কণ্ঠ তুলিয়া ভেকেরা উঠিছে জেগে,
ঘরে ঘরে ঘরে শিকল বাজিয়ে বায়ু দিয়ে যায় নাড়া,
আর্দ্র-পাখায় সিক্ত-শাখায় পাখিরা না দেয় সাড়া ;
কাহার হৃদয় কাঁপিছে সেতারে মল্লারে মীড় টানি—
সে ব্যথা কাহার, কেহ না জানুক, আমি তাহা মনে জানি!

কোথায় কাঁপিছে করুণ সেতার, কোথায় কাঁদিছে বাঁশি,
দুটি অন্তর কত দূর থেকে তবু কত পাশাপাশি!
দুটি হৃদয়ের ইঙ্গিত দিয়া হৃদয়ের বিনিময়,
দুটি সুকরুণ সংগীত মাঝে সুনিবিড় পরিচয়!
কোথা পড়ে আছে দেহের সীমানা, কোথা মিলে আসি প্রাণ,
অন্তরায়ের অন্তর টুটি মিলনের মহাগান।

এমনি যেন গো চিরদিন ধরে দূরে থেকে থাকি কাছে ;
এর বেশি যেন চেয়ে কোনো দিন কাঁদিতে না হয় পাছে ;
অন্তর মাঝে থাকিতে আলোক, দূরে যেন তারে খুঁজি ;
ভালো করে যেন বুঝিবারে গিয়ে মূলেই ভুল না বুঝি!
দূরে থেকে যেন চিরদিনরাত দু-জনারে বাসি ভালো—
দু-খানি হৃদয় উজলিয়া রাখে প্রেমের অমৃত আলো।

সরোবরে সন্ধ্যা

শরাস্তৃত সরোবর : তীরে তীরে তারি তালিবনশ্রেণী ;
শ্যামল-সরসী-শিরে পদ্ম-বিভূষণা শৈবালের বেণী।
ধীরে নামে সন্ধ্যাসতী ধূসর অঞ্চল অম্বরে লুটায়ে ;
ঝিল্লির মঞ্জীর মালা ঝিমি-ঝিমি-ঝিমি বাজে পায়ে পায়ে।

জনশূন্য দুটি তীর—ধীবরসন্তান গেছে ঘরে ফিরে,
ডোঙাগুলি কূলে বাঁধা শিহরিয়া কাঁপে সন্ধ্যার সমীরে ;
গোধন গুছায়ে লয়ে নিভ-নিভ হতে গোধূলি-আলোক,
ফেলিয়া কলার ভেলা, ঘরে ফিরে গেছে রাখাল বালক।

নিভৃত কুলায়ে দিল মরালের দল শেষ পাখাঝাড়া,
নিঃসঙ্গ মরাল-শিশু চীৎকারিছে দূরে হয়ে দলছাড়া ;
ধূসর আকাশপটে তরঙ্গিয়া দিয়া ভ্রুবঙ্কিম রেখা—
অস্পষ্ট নক্ষত্রালোকে বাদুড়ের শ্রেণী ঊর্ধ্বে দিল দেখা।

সিক্ত শৈবালের গন্ধে পূর্ণ হ'য়ে উঠে সন্ধ্যার বাতাস ;
হিমসিক্ত শস্যক্ষেত্র তারি সাথে ফেলে দিনান্ত-নিশ্বাস।
জলে জলে নভস্তলে মোহিনী সন্ধ্যার নির্বাক মন্তরে—
অশরীরী কম্পযন্ত্রে শান্তিরসধারা ঝর-ঝর ঝরে।

ভ্রান্তি

ভুল করেছিস্ পুরনারী তোরা—
সন্ধ্যারে ডাকি শঙ্খ বাজায়ে,
ভুল করেছিস্ প্রাঙ্গণ তলে
যত্নরচিত দীপটি সাজায়ে ;

অম্বরতলে ওই যে আঁধার,
অন্ধ, ও তোর সন্ধ্যা নয় রে—
আপন মনের গোপন তিমিরে
দৃষ্টি তোদের কালিমাময় রে।

ধূপের-দীপের কিবা প্রয়োজন,
পুরোহিত, তব একি এ ভ্রান্তি,—
সাগ্রহে শুধু ডাক চণ্ডীরে,
উচ্চার শুধু মন্ত্র 'শান্তি'।
মঙ্গল-ঘট, শান্তির বারি,
পূজা-আয়োজন, সকলি মিথ্যা—
অন্তরে যদি না থাকে ভক্তি,
নিষ্ঠা না থাকে সবল চিত্তে।

হায় কবি, হায়—একি ছেলেখেলা,
প্রণয়ের সুরে বাঁশিটি সাধিয়া,
করুণ কণ্ঠে কোমল কাকলি—
কলরব কর কাঁদিয়া কাঁদিয়া ;
দুয়ারে দৈন্য শিয়রে দুঃখ,
বীণা কোলে তুমি রয়েছ বসিয়া—
চেষ্টাহীনের আত্মপ্রসাদে
তুষ্ট তৃপ্ত দৈবে দোষিয়া!

অন্নহীনের—আর্ত তীব্র
রোদন উঠিছে গগন ভেদিয়া—
অশ্রু তাদের মুছাবি কী করে—
শূন্য জঠর ভরাবি কী দিয়া?
জরায় রুগ্‌ণ, শ্রমেতে ভয়,
নিরাশামগ্ন লক্ষ বিষাদে—
এ সব দুঃখ ঘুচাবি না যদি,
ছন্দের মালা গাঁথিস্‌ কী সাধে!

চক্ষের কোণে ওকি ও অশ্রু—
অশ্রুর আজি সময় নাহি রে,
অশ্রুরুদ্ধ বজ্রবক্ষে ইষ্টসাধন
নিষ্ঠা চাহি রে ;
সত্যের আলো লক্ষ্য করিয়া
দুঃখ-সাগরে হ দেখি যাত্রী—
দেখ্‌ ফুটে কী না সূর্য-কিরণ,
দেখ্‌ টুটে কী না তমসা-রাত্রি।

ভুল যদি হয়, ভেঙে যাবে ভুল,
সত্যের আলো জগতে ধন্য,
নিদ্রিত তোর চিত্ত-দুয়ারে
উঠুক্‌ বাজিয়া পাঞ্চজন্য ;
মিথ্যার সাথে সংগ্রাম যবে—
ভয় কী, যাহার কৃষ্ণ সারথি!
নূতন ছন্দে হউক দীক্ষা—
আজি তোর কাছে জননী ভারতী।

খেয়া-ডিঙি

(ভাদ্রে)

পাটের ক্ষেতের ভিতর দিয়ে ঘাটের ডিঙা বাই—
তবু আমার হাটের সাথে কোনো বাঁধন নাই ;
শিরা-ওঠা ফাটা-হাতে হালের গোড়া ধরি
আমি শুধু আপন মনে এপার-ওপার করি।

তোমরা ভাবো ক্ষেত আর ফসল, বৃষ্টি বাদল বান,
ডুব্‌ল কত, বাঁচল কত ভরা ভাদুই ধান,
আমার কিন্তু সে সব দিকে খেয়াল-খবর নাই—
আমি আমার নিয়ম মতন ঘাটের ডিঙা বাই।

ভাদর আসে মরা গাঙে ভরা বন্যা নিয়ে—
রাঙা জলে এপার-ওপার এক্‌সা করে দিয়ে ;
লগির গোড়া পায়না তলা, মিলে না আর থই,
দিনে রাতে তবু আমার ঘাটের ডিঙা বই।

হঠাৎ যেদিন বানের জলে ছাপিয়ে উঠে মাঠ,
হাঁটু নাগাল ধানের জমি, গলা-নাগাল পাট
কানাকানি বানের জলে ধানের আগা দোলে,
টল্‌মলিয়ে ডিঙা আমার চলে তারি কোলে।

কোথায় বা সে আলের রেখা, কোথায় বা সে বাঁধ,
বাবলা গাছের বেড়া নিয়ে কোথায় বা বিবাদ!
বাঁধন-হারা বানের মুখে বিধি-বিধান নাই—
সীমাবিহীন সাঁতার ক্ষেতে ঘাটের ডিঙা বাই।

কোমর-জলে দাঁড়িয়ে কসে কাস্তে চালায় চাষি,
ধানের শিষের সোঁদা গন্ধে হাওয়ায় উঠে ভাসি :
কাজল-কটা ধানের ডগা নুইয়ে জলের তলে
মস্‌মসিয়ে তারি মাঝে ডিঙা আমার চলে!

আঁটি বাঁধা ধানের রাশি এপার-ওপার করি,
পালা বাঁধা পাটের গাদা বোঝাই করে মরি ;
দিনে রাতে কত লোকের কত কথা শুনি—
আমি বসে আপন মনে খেয়ার কড়ি গুনি।

জলের গায়ে সিঁদুর ঢেলে সুয্যি উঠে পুবে,
দিনের খেয়া সেরে আবার পশ্চিমেতে ডুবে ;
বারোমাসে একটি দিনও ছুটি কামাই নাই,
তারি সাথে আমি আমার ঘাটের ডিঙা বাই।

অপরাজিতা

পরাজিত তুই সকল ফুলের কাছে,
  তবু কেন তোর অ-পরাজিতা নাম?
গন্ধ কী তোর বিন্দুমাত্র আছে—
  বর্ণ সেও তো নয় নয়নাভিরাম!

ক্ষুদ্র শেফালি, তারো মধু-সৌরভ,
  ক্ষুদ্র অতসী, তারো কাঞ্চন-ভাতি ;
গরবিনি, তোর কিসে তবে গৌরব—
  রূপ গুণহীন বিড়ম্বনার খ্যাতি!

কালো আঁখিপুটে শিশির-অশ্রু ঝরে—
  ফুল কহে, মোর কিছু নাই—কিছু নাই ;
তোমরা যে নামে ডাকিয়াছ দয়া করে,
  আমি শুধু ভাই, তাই—আমি শুধু তাই!

ফুলসজ্জায় লজ্জায় যাইনাকো,
  পুষ্পমালায় নাহিকো আমার স্থান ;
প্রিয়-উপহারে ভুলেও কি মোরে ডাক?
  বিবাহ-বাসরে থাকি আমি ম্রিয়মাণ।

মোর ঠাঁই শুধু দেবের চরণতলে,
  পূজা—শুধু পূজা জীবনের মোর ব্রত ;
তিনিও কি মোরে ফিরাবেন আঁখিজলে—
  অন্তরযামী, তিনিও তোমারি মতো।

আগমনী

আজি, রজনী না হতে ভোর,
শিশির-আর্দ্র বাতাসের মুখে বারতা পেয়েছি তোর ;
তবু ছিল মনে সংশয়—
পাগল হাওয়ার এমন কথাটা বুঝি-বা সত্য নয়!
শুভ্র রোদের সাদা আলিপনা উঠানে পড়িতে ধীরে,
বুঝিনু জননি, সন্তান-গৃহে আবার এলি মা ফিরে ;
তবে, কোথায় লুকালি বল্—
এতদিন পরে এলি যদি মাগো, কোথা শিখে এলি ছল?

সারা দিনমান আর
পাইনিকো আমি খুঁজে-খুঁজে-খুঁজে কোনো সন্ধান মার!
শুধু, বারেক দুপুর বেলা,
যবে রোদে আর মেঘে নদীসৈকতে খেলাইতেছিল খেলা।
একবার যেন চখার কণ্ঠে পেয়েছিনু তার সাড়া—
মন্দিরে-ঘরে মিছা খুঁজিলাম, ঘুরিলাম সারা পাড়া।
ওগো, কেমন যে তুই মা—
এই তোরে পাই, নয়ন পালটি এই আর পাই না!

এইবার পেনু তোরে,
সন্ধ্যা-রঙীন শিউলির আড়ে লুকাবি কেমন করে?
আবার লুকাতে চাস্?
ওই যে দুলিল পুষ্পিত শাখা, ওই যে পড়িল শ্বাস!
আঁধার ঘনায়, তবু দেখা যায় দোপাটির ফাঁকে-ফাঁকে
মা তোর শাড়ির পাড়ের প্রান্ত—আর ফাঁকি দিবি কাকে?
ঘুরিতে বেড়ার ঘের,
টগরের মুখে হাসিটি রাখিয়া কোথায় লুকালি ফের!

তোর—রক্ত-চরণতল
মনে হল যেন ছুঁইলাম বুঝি, মুদিল কমলদল!
ব্যথায় ফিরাব মুখ—
সন্ধ্যা-হাওয়ায় পরশিলি গায় জ্যোৎস্না-চীনাংশুক
অমনি ঊর্ধ্বে চাহিয়া হেরিনু পঞ্চমী-রাকা-চাঁদে—
মা তোর মুখের মোহন ভঙ্গি আধ-ঢাকা বাঁকা ছাঁদে ;
তারা-ঘেরা কেশভার
মেঘের গা দিয়া গড়ায়ে পড়েছে দূর দিগন্তপার!

মা তোর একি এ ভাব?
এই হেরি তোর রূপ, ফিরে দেখি অরূপ আবির্ভাব।
অরূপ লুকায় রূপে,
রূপ ও অরূপ মিলায় আবার অপূর্ব অপরূপে!
দশদিকে তোর হেরি রূপরাশি, কোনো দিকে নাহি পাই!
স্বরূপের মাঝে মন ও চক্ষু ডুবে যায়—ডুবে যায়!
একবার কাছে আয়,
দেখা দে মা আজ—দেখা দে মা আজ মূর্তির মহিমায়।

জীবন ও মৃত্যু

জন্মের মাঝে মৃত্যুর বাস,
সুখের মাঝারে দুখ ;
ওরে মন, তুই জেনে-শুনে তবু
কেন বিষণ্ণ মুখ?

ফুলের কোরকে ফলটি হেরিয়া
ব্যথা পেয়েছিস্ কবে?
জীবনের মাঝে মরণে দেখিয়া
নয়ন মুছিতে হবে।

চন্দ্র সূর্য অস্ত যায় সে,
আবার ফিরিয়া উঠে ;
ফলটি ফলায়ে ফুল ঝরে যায়,
সেই ফলে ফুল ফুটে!

দিবসের শেষে রাত্রি আসেই—
দিন আর ফিরে না কী?
তোরি সে মৃত্যু-রাত্রির শেষে
দিবস রহিবে বাকি!

মৃত্যুর মানে শেষ নয় শুধু—
নব-জীবনের সূত্র ;
দুঃখের কোল ভরি দেখা দেয়
আনন্দ-বরপুত্র!

রে অবিশ্বাসী, সৃষ্টির বিধি
তোরি তরে হবে ভিন্ন?
বিশ্ববিধানে চুনে-চুনে নে রে
এক-ই সে চরম-চিহ্ন।

জীবন-মৃত্যু তাঁহারি সে দান,
তাঁরি দান সুখ-দুখ ;
ওরে মন, তুই সেই বিশ্বাসে
বেঁধে নে রে আজ বুক।

সুখ ও দুঃখ—চড়া আর খাদ
উঠে নামে ঘুরে-ঘুরে—
বেজে উঠে তার পূর্ণ রাগিণী
জীবন-যন্ত্র-সুরে!

নববর্ষা

বৎসরে আজি প্রথম বৃষ্টি, আয় তোরা নরনারী,
নবীন মেঘের মুক্ত দুয়ারে দাঁড়া আজি সারি-সারি ;
এ বৃষ্টি শুধু বর্ষণ নয় এ যে আনন্দ-ধারা মধুময়,
ধরণীর শুভ-অভিষেকে আজি ঝরিছে নীরদ-ঝারি—
বৎসরে আজি প্রথম বৃষ্টি—ছুটে আয় নরনারী।

মৃত্তিকা মার বুকের দুলাল, কৃষানেরা তোরা আয়,
মেঘের কণ্ঠে বাজিছে বিষাণ, শুনিতে কী পাস্ নাই?
কৃষক-বধূরা কোথা তোরা আজি কুটির বাহিরে ছুটে আয় সাজি—
তোদেরি ডাকিয়া উঠে বাজি মেঘমল্লার-বেদনায়,
আভরণ-হীনা, শিশু-আভরণে সাজি আয় আঙিনায়।

গোহাল আজিকে শূন্য করে দে, ধেনুদের দে রে ছাড়ি.
পুণ্য লাঙলে বৃষ্টি লাগারে গৃহকোণ হতে পাড়ি ;
অঙ্গন-কোণে ছাগশিশুগুলি এখনো তাদের দিস্ নাই খুলি?
মুক্ত করে দে—মাতিয়া তাহারা বেড়াক্ সকল বাড়ি ;
উৎসবদিনে বন্ধন কেন? সবারে দে আজ ছাড়ি।

শিশুদের আজ কে করে রুদ্ধ? জননীর নহে কাজ ;
জগৎ-জননী নিজে যে তাদের খেলায় ডেকেছে আজ।
বৃষ্টির ধারা অঙ্গের সাথী নয়ন মাতায় বিদ্যুৎপাতি,
পাগল পবনে মন উঠে মাতি, কর্ণের সাথী বাজ—
বিশ্বজননী আপনি তাদের খেলায় ডেকেছে আজ।

রে পুরললনা, ছাড়িয়া দিয়ো না, প্রিয়জনে বাঁধ বুকে ;
বাহুতে বাহুতে বাঁধিয়া আজিকে দাঁড়াও ঊর্ধ্ব মুখে।
নববরষার মিলনের গান ভরিয়া তুলুক উৎসুক কান,
এক হয়ে যাক্ দু-খানি পরান অপূর্ব মহাসুখে,—
ঝরিয়া পড়ুক পবিত্র ধারা মিলন-মুদিত মুখে।

'মালাকাটা' বেড়ি ওই যে মালতী, ওরে কী বলিল কে?
নীরস অঙ্গ সহসা ভরিল যৌবনগরবে!
যুথি-বিধবার রুখু এলোচুলে কে ঢাকিয়া দিল শ্যামল দু-কূলে,
কেলিকদম্ব লাবণ্যময়ী কাহার ইঙ্গিতে—
কাননের কোল ভরি কে তুলিল বরষা-সংগীতে?

দুলিয়া-ফুলিয়া চলিয়াছে নদী সিন্ধু দরশ আশে,
ঝর্ঝরস্বরে নির্ঝর আসি মিশিছে তাহারি পাশে ;
বাতাসের মুখে শুধু কলগান, আকাশে উড়িছে মিলন-নিশান,
বিশ্বসাগরে জেগেছে তুফান আনন্দরসাভাসে,
গিরিরে চুমিতে নেমেছে অভ্র ধরারে ধরিতে পাশে।

সৃষ্টির মহাপ্রাঙ্গণে আজ বৃষ্টির হোরিখেলা,—
আকাশে বাতাসে মিলি, আজি মহামিলন-দোলের মেলা!
ঝরে অফুরান ধারা-পিচিকারি নরনারী, সবে দাঁড়া সারি-সারি,
ওরে অভাগ্য, মানিবি কি হারি, ছুটে আয় এইবেলা—
সৃষ্টির মহাপ্রাঙ্গণে আজি বৃষ্টির হোরিখেলা!

আজি বৎসরে প্রথম বৃষ্টি—ছুটে আয় নরনারী,
অন্তবিহীন মেঘমণ্ডপে দাঁড়া আজি সারি-সারি ;
এ বৃষ্টি শুধু বর্ষণ নয় এ যে অমৃতের ধারা মধুময়,
মর্ত্যের তৃষা মিটাতে আজিকে ঝরিছে স্বর্গবারি—
মাথা নত করে দাঁড়া আজি সবে তৃষার্ত নরনারী।

শেষ

শেষ অঞ্জলি নিঃশেষ আজি—
শেষ সাজি যাহা ভরিবার ;
পরাজিত এই অপরাজিতার
সময় হয়েছে ঝরিবার !

অন্তরযামী দেবতা,
পুষ্পজীবন বৃথা গেল বহি—
কেমনে ভুলিব সে কথা !

কুঞ্জ ভরিয়া ধ্বনিয়া উঠিল
অপরাজিতার পরাজয় ;
সুদূরে—আঁধারে কে অপরিচিতা
হাসিয়া দেখায় বরাভয় !

সে অভয়ে আর কিবা ফল ?
মুদিয়া এসেছে আঁখি-পল্লব—
ধুলায় লুটায় ঝরা-দল !

কোজাগর-লক্ষ্মী

শঙ্খ-ধবল আকাশ-গাঙে স্বচ্ছ মেঘের পাল্‌টি মেলে
জ্যোৎস্না-তরী বেয়ে তুমি ধরার ঘাটে কে আজ এলে ?
ক্ষীরোদ-সাগর-ছেঁচা চাঁদের টিপ্‌টি দেখি ললাটপটে
কুমুদমালার বরণডালা লুটায় তব চরণতটে,
কাশের কোলে চামর দোলে, ছত্র শোভে ছাতিম ফুলে,
আসন তোমার পাতা দেখি শুক্তি-গাঁথা নদীর কূলে—
তুমি কি মা লক্ষ্মী আমার দাঁড়ালে মোর কুটির-দ্বারে,
জ্যোৎস্না-তরী বেয়ে এসে মুক্তা ধবল ধরার পারে ?
কে বলে রূপ নাই দেবতার—কে বলে তার মূর্তি নাহি ?
যে বলে সে নয়ন মেলে আজকে রাতে দেখুক চাহি !
দেখুক এসে অবিশ্বাসী আমার মায়ের রূপটি কিবা,
চরণে তাঁর লুটায় কিনা লক্ষ চাঁদের রৌপ্য-বিভা !

কোজাগরের লক্ষ্মী হের—এলেন আজি মূর্তিমতী,
চন্দনে ও আলিম্পনে অর্ঘ্য রচ ভাগ্য-বতী ;
গাঁথ মালা শুভ্র ফুলে সাজাও ডালা লাজের রাশে ;
শ্বেতপাথরের থালা ভরাও নারিকেলের শুক্ল শাঁসে ;
শর্করা আর ছানার যোগে ভোগের থালা পূর্ণ কর,
শঙ্খপরা গৌর হাতে ঘৃতের দীপটি তুলে ধর ;
আত্মা 'পরে দৃষ্টি রাখ মনের ময়লা ফেল ধুয়ে—
শুভ্র প্রাণে শুক্ল বাসে প্রণাম কর চরণ ছুঁয়ে।

প্রণাম কর—ঊর্ধ্বে হের বিশ্বভুবন সিক্ত করে
মায়ের আশিস্-কিরণ-ধারা মাথার 'পরে পড়ছে ঝরে
চক্ষু-মনের তৃপ্তিভরা দীপ্তিমতী মূর্তিখানি—
দেখ্‌রে চেয়ে অবিশ্বাসী কোজাগরের লক্ষ্মীরানী।

কাঞ্চন

গোলাপ যখন বিদায় নিয়েছে শীতের বাসর থেকে,
কুসুমকুঞ্জে ভেঙেছে মাঘের মেলা
চৈত্রের সভা পাঠায়নি যবে পুষ্পবালারে ডেকে—
গরবী করবী, বিরহিণী বন-বেলা ;—
ফাল্গুন-সাঁঝে ধীরে আসে—ও সে কে?
সঙ্কোচে নত রাঙা কাঞ্চন যে!

আসনিকো তুমি রানীর গরবে কুঞ্জ-সিংহাসনে,
গন্ধে আনো না পথিকেরে কাছে ডাকি ;
চম্পা-গরিমা নাহিকো তোমার মুকুলিত স্মিতাননে,
তীব্র মদিরা পরাগে রাখ না ঢাকি ;
তুমি শুধু কহ—আর কেহ যবে নাই—
শ্রান্ত পথিক, তবু আমি আছি ভাই।

রূপটি তোমার উজ্জ্বল নহে আঁখি ভুলাবার মতো,
—তরুণী কিশোরী মুদিত বাসররাতে ;
মৃদু সৌরভ বহি আনে মনে অতীতের কথা যত,
অশ্রুবাষ্প ছেয়ে আসে আঁখিপাতে ;
ফিরে আনো মনে হারানো হৃদয়ধন—
নাসিকার আগে ভরে উঠে মোর মন!

মনে পড়ে সেই শান্ত প্রভাতে করেতে শূন্য সাজি,
ব্যাকুলা বালিকা তাকায়ে তোমার পানে ;
লুব্ধ হৃদয়, সাধ্য নাহিকো আহরিতে ফুলরাজি,
মৌন মিনতি আঁকা যেন দু-নয়ানে ;—
তাড়াতাড়ি তুলি দিতে গেনু যেই ফুল,
ছুটিয়া পালাল দুলায়ে কর্ণ-দুল।

আরো একদিন—স্তব্ধ দুপুর, ঝাঁঝাঁ করে চারিধার
পল্লব তব দুলিছে তপ্ত বায়ে ;
ধুলামাখা শিশু তরু'পরে বসি, কানে গোঁজা ফুল তার,
নামিতে জানে না—ঠেকেছে বিষম দায়ে!
নিচে মা তাহার, ভয়েতে আত্মহারা ;
নামায়ে দিলাম—জননী কাঁদিয়া সারা!

এইমতো কত ছোটখাটো যত শৈশব-অভিনয়,
ভুলেছিনু যাহা—অথবা ভুলিতে বাকি ;
মৃদু বাসে তোর সেই সব কথা ফিরে-ফিরে মনে হয়,
পার-হওয়া পথে ঘুরে মরে মনোপাখি।
ফুল নোস্ তুই—রঙিন স্মৃতির আলো—
তাই তোরে আজি আরো সে বেসেছি ভালো।

কোনো কবি তোর নাম করেনাকো, রে চির-অনাদৃতা,
অনাস্বাদিত চিরদিন তোর মধু ;
তুই থাক্ মোর পূজারি প্রাণের সুগোপন-বন্দিতা—
বঙ্গগৃহের অন্তঃপুরিকা বধূ ;
মৃদু সৌরভে ভরি অঙ্গনতল,
চিরগৌরবে থাক্ চির উজ্জ্বল!

ঘুমহারা

তুমি আমায় বক্‌ছ কেন, মা!
আজকে আমার ঘুম যে আস্‌ছে না—
ঘুমাই কেমন করে?
কী সব কথাই মনে যে—মা, আসে—
এইখানেতে বাবা শুতেন পাশে,
গলাটি মোর ধরে!

আচ্ছা—মা, ওই কালো ঘোড়ায় চড়ে
কোথায় গেলেন? যদি, মা—যান পড়ে—
ঘোড়া যে বজ্জাত।
বল্ না মাগো—কোস্‌নে কেন কথা?
খেলেন কোথায়, শুলেনই বা কোথা—
এখন যে, মা—রাত?
(বাহির-দোরে কে ঠেলে ওই আগল—
এরি মধ্যে ফিরে আসবে? পাগল!)
—বক্‌তে আমি পারিনি রাত-ভোর,
পোড়া চোখে ঘুম কেন নাই তোর?

আচ্ছা, মা—ঘুম কোথায় থেকে আসে?
দিনে বুঝি লুকিয়ে থাকে—মা, সে—
কোথায় ঘুমের বাড়ি?
সবাই রাতে ঘুমায়—ঘুম তো মেলা!
কাদের সাথে তাদের মা আজ খেলা—
আমার বুঝি 'আড়ি'!

ঝিঁঝিদেরও আড়ি, তাইতে ডাকে,
সারারাত মা জেগে তারা থাকে—
শুধু বাজনা বাজায়
জোনাক্-পোকাও ঘুমায় না মা, রাতে,
রোজই বিয়ে হয় মা, কাদের সাথে—
রোজই আলো সাজায়?

—তোর সাথে আর বক্‌তে পারিনি—
পোড়া চোখে ঘুমের হল কি?
—তোরও, মা—আজ কী হয়েছে যেন!
রোজ কথা কোস্—আজকে এমন কেন?

নাগকেশর

চিত্ততলে যে নাগবালা ছড়িয়ে-ছিঁড়ে কেশের কেশর কাঁদছে—
অফুরন্ত অশ্রুধারায় সহস্রবার নাসার বেশর বাঁধছে ;
মানিকহারা পাগলপারা যে বেদনা বাজ্‌ছে তাহার বক্ষে,
পলে-পলে পলক বেয়ে অলক ছেয়ে ঝরছে যাহা চক্ষে ;
দুঃখে-ভাঙা বক্ষে যাহা নিশ্বসিয়া সকাল-সাঁঝে টুটছে—
মহাকালের সোপানতলে নাগকেশরের ফুল হয়ে তাই ফুটছে।

মনপাতালে যে নাগবালা রতন-জ্বালা কক্ষে বসে হাসছে—
দীপ্তি যাহার নেত্রপথে শুভ্র-শুচি দৃষ্টি হয়ে আসছে ;
মুক্তামানিক সবার মাঝে বিলিয়ে দিয়ে উল্লাসে যে চঞ্চল,
উদ্বেলিত সিন্ধুসম দুলছে যাহার উচ্ছ্বসিত অঞ্চল ;
বিশ্বভুবন পূর্ণ করে যে আনন্দ শঙ্খস্বরে উঠেছে—
মহাকালের সোপনতলে নাগকেশরের ফুল হয়ে তাই ফুটছে!

তাই দিয়ে আজ পূজব তোমায় ভস্মভূষণ হে আশুতোষ ব্যোমকেশ!
নাগকেশরের অর্ঘ্যে আজি কর হে শিব অক্ষি তব উন্মেষ।
দুঃখ-সুখের বক্ষে পড়ুক উদার তব চন্দ্রকলার দীপ্তি,
জটাজালের ঝাপ্‌টা লেগে অশ্রুজলের তর্পণে হোক তৃপ্তি।
নাগ যে তোমার কণ্ঠভূষা, কেশর তব আষাঢ়-মেঘের কান্তি ;
প্রসাদী-ফুল নাগকেশরে ছড়িয়ে দিলাম—শিবের প্রসাদ শান্তি।

রথযাত্রা

চক্রনেমির ঘর্ঘররবে নির্ঘোষি রাজপথ,
বিশ্ব কাঁপায়ে চলেছে রে আজ বিশ্বরাজার রথ।
ধনী গৃহস্থ শিশু বয়স্থ—আয় সবে ছুটে আয়—
জগৎনাথের রথের যাত্রা তোরি দ্বার দিয়ে যায়।

মেঘদুর্দিন দুর্যোগে আজি গর্জিছে বারিধার,
সঙ্কটময় পঙ্কিল পথ, শঙ্কিল চারিধার ;
যে থাকে যেথায়—আজিকে হেথায় মিলিতে সবাই হবে,
বিশ্বনাথের ডঙ্কা বেজেছে মেঘ-ভৈরব রবে।

কে আছে বিকল, কে আছে বধির, কে আছে অঙ্গহীন,
কে সে নপুংস ক্লীবের বংশ, ক্ষয়ক্ষীণ মহাদীন ;
আজি এ রাত্রি যে নহে যাত্রী, থাক্ সে আপন ঘরে—
শয্যালগ্ন সুপ্তিমগ্ন লুটায়ে ভূমির 'পরে।

আয় তোরা যত নবীন প্রবীণ কিশোর কুমার দল,
কল-কোলাহল-কর্মপাগল আয় বলচঞ্চল,
বাঁচিস্ মরিস্, আজি না ধরিস্, কাছিতে লাগারে হাত—
তোদেরি ঐক্যে মিলিত জানিস্ মিলন-জগন্নাথ!

লক্ষ দৃপ্ত মত্ত বাহুতে রশিতে পড়ুক টান,
আজি যে কেবল চলচঞ্চল চল্-চল্ অভিযান ;
নাহি আগুপিছু সন্দেহ কিছু—শুধু সম্মুখগতি,
লক্ষ লোকের লক্ষ্য সে এক সঙ্গের সঙ্গতি।

আজি এ রথের পুরোহিত নাই—ধর্ম নিজেরে ধরে,
নাহিকো মন্ত্র—পূজার তন্ত্র মিলিত কণ্ঠস্বরে ;
ধূলি-কলঙ্ক তিলকপঙ্ক, চন্দন স্বেদনীর—
অযুত আর্তকণ্ঠে উঠিছে কীর্তন সুগভীর।

ঘর্ঘরি ঘুরে কর্মচক্র নির্ঘোষি ধরাপথ,
বিশ্বেরই মাঝে ছুটিয়া চলেছে বিশ্বরাজের রথ ;
সেবানুরক্ত অযুত ভক্ত দেশে-দেশে দিশে-দিশে,
সকল বিভেদ ভুলিয়া আজিকে এক সাথে গেছে মিশে!

কেহ অর্পিছে বক্ষের বল, কেহ চক্ষের জ্যোতি,
বাহুর শক্তি কেহ বা বিলায়, কেহ বা মিলায় গতি,
যার আছে যাহা সেই দেয় তাহা, আজি মাহেন্দ্রক্ষণে,
জগৎস্রষ্টা একক দ্রষ্টা হাসিছে উদাস মনে!

আকাশ যেথায় সিন্ধুরে ধরে, সিন্ধু ধরার হাত,
বিশ্বজনারে মিলাইতে তাই দৃশ্য জগৎনাথ ;
যত জাতি-পাঁতি সব একসাথী যাঁহার চরণ পাশে,
উঁচু আর নিচু নাহি যেথা কিছু—সমান দ্বিজে ও দাসে।

মহামানবের মিলনক্ষেত্র—শ্রীক্ষেত্র নাম তাই!
মহামিলনের পদধূলিপূত—তাই সে তীর্থ ঠাঁই ;
নীতি ও আচার বিধি ও বিচার বিতর্ক সব ভুলি
নে রে নে মানব মাথায় তুলিয়া সেই পবিত্র ধূলি।

চিত্ত ভরিবে সাহসে আশায়, বক্ষ ভরিবে বলে,
রক্ষিতে হবে মনোরথসম শতেক যোজন পলে ;
সাগরবেলায় পরশি হেলায় কাঁপায়ে বিমানপথ
জগতের সীমা ছাড়াইয়া যাবে জগন্নাথের রথ।

ওরে কবি, তুই এ মহামেলায় কী করিবি তাই বল্—
তোর হাতে এই তালপত্রের শিঙা শুধু সম্বল।
তাই যদি হয় তবে এসময় প্রাণপণে তাই বাজা,—
তাঁর কাছে তাও পঁহুছিবে ক্ষ্যাপা, যিনি এ রথের রাজা!

স্বপ্নরানী

মনের বনের গহন-কোণে
আছে যে এক দেশ—
সপনরানী থাকেন সেথায়
মেঘের মতো কেশ ;
হস্তিশালায় অশ্ব বাঁধা
অশ্বশালায় হাতি,
অলিন্দেতে অচেনা সব
পাখি নানান্ জাতি ;
বাগান-ভরা পদ্ম সেথায়
গোলাপ-পুষ্করিণী,
মালিনী সব দাঁড়িয়ে যারা—
চিনেও নাহি চিনি ;
প্রাসাদে সব দুয়ার-খোলা,
বাতাস বেড়ায় মাতি ;
শূন্যে দোলে হাজার ঝাড়ে
কালো-আলোর বাতি ;
রানী থাকেন বাহির বাড়ি,
রাজা অন্তঃপুরে,

নহবতে জলতরঙ্গ
বাজছে কোথা দূরে ;
সূর্য ডোবার আগেই সেথা
চাঁদটি উঠে হেসে,
ঝিল্লি-ডাকা তন্দ্রা-ঢাকা
স্বপ্নরানীর দেশে।
স্বপন-রানীর আবাসখানি
আবছায়াতে ঢাকা,
দ্বারের কাছে জড়িয়ে আছে
কল্পগাছের শাখা ;
মেয়েরা সব গাঁথছে তুলে
মুক্তাফলের মালা,
ছেলেরা সব প্রবাল তুলে
ভরছে সোনার ডালা ;
জান্‌লা-পাশে উর্ণনাভের
ঝুলছে সরু পরদা,
সুরবাহারে কাঁপছে যেন
জংলা সরফরদা!
স্বপনরানী হাওয়ার মতো
ঘুরে বেড়ান পাশে,
অঙ্গ হতে পারিজাতের
গন্ধ ভেসে আসে ;
পরনে তাঁর ঝিকি-মিকির
বসনখানি ঝলে,
জ্যোৎস্না-রাতের আলোক যেন
আমলকির তলে ;
হাতে দুটি পরশকাঠি
মুখে নাইকো বাণী,
কাঁকনখানি ঝিঁঝির সুরে
তন্দ্রা আনে টানি ;
সন্ধ্যালোকের ওড়নাখানি
উড়ছে কালো কেশে—
কুজ্ঝটিকার পর্দা-ঢাকা
স্বপ্নরানীর দেশে।
নাইকো সেথা গৃহী গরিব,
নাইকো বড়লোক,

সত্য বাঁধা স্বপ্নজালে,
মিথ্যা মায়ালোক ;
মাটির কোঠা, ইঁটের দালান
খড়ের চালা-ঘর,
নাই সে কিছু ; নাইকো নিকট,
সুদূর দূরান্তর ;
মেঘের ঘরে দুয়ার কোথা?
বাধা-বাঁধন নাই,
পথ-হারানো হাওয়ার মতো
সবাই ভেসে যায় ;
আপন পরের প্রভেদ কিছু
যায় না সেথা জানা,
পরে যাহার নাইকো বাধা
আপনে তাই মানা ;
যে প্রিয়জন-মিলন-পথে
জগৎ রুধে পথ,
সেখানে সে তোমার দ্বারেই
এগিয়ে আনে রথ ;
ধরায় যারা হারিয়ে গেছে,
যায় না পাওয়া কাছে,
তারা সেথায় হয়তো পাশে
আপনি মিলিয়াছে ;
যে প্রতিমা হেথায় ডোবে—
ওঠে সেথায় ভেসে,
নিখিল-ছাড়া বিধান-হারা
স্বপ্নরানীর দেশে।
এ জগতের চরম তথ্য—
সত্য বল যারে,
সেই যদি হায়, মিথ্যা হয়ে
মিলায় অন্ধকারে!
কঠিন মাটির অটুট বাঁধন—
সেও যে তাসের ঘর,—
জীবন-অধিক সম্বন্ধ সে,
ঠকায় পরস্পর!
যুক্তি যখন কহে—জীবন
পদ্মে বারি কণা,

অলীক অসার মায়া সবই
অবিদ্যা কল্পনা ;
প্রাণের অধিক ভালোবাসা
রাখতে পারে কারে—
মৃত্যু যেদিন হাত বাড়িয়ে
দাঁড়ায় এসে দ্বারে?
জ্ঞানই যখন অজ্ঞানাধিক—
আলোর বেশি কালো,
সত্য যখন মিথ্যা এত,
স্বপ্ন—সে তো ভালো!
জাগার চেয়ে সুপ্তি তখন
শাপের মাঝে বর,
ওরে ক্ষ্যাপা, তার মাঝে তুই
তোল্ রে আজি ঘর ;
হাসি যখন অশ্রুজলে
যায় রে হেথায় ভেসে,
কিসের ক্ষতি—বাঁধ না বাসা
স্বপ্নরানীর দেশে!

বঙ্গবধূ

ওগো বঙ্গের বধূ—
তরল-মধুর ভাবখানি তোর মৌচাক-ভাঙা মধু ;
তুলনা তোমার ভুবনে মিলে না খুঁজি,
বসনে গোপনে লুকায়ে প্রাণের পুঁজি—
পূজিছ পরান-বঁধু।
পরিহিত নীলবাস—
পাতা-চাপা যেন জহুরি চাঁপাটি—ঢাকা থাকে বারোমাস
গন্ধ তাহার লুকানো সবার কাছে,
পূজার ফুলটি অনাঘ্রাতই আছে—
সুগোপন পরকাশ।

খয়ের-টিপ্‌টি ভালে—
পলকবিহীন তৃতীয় নয়ন চির-দিঠি-সুধা ঢালে।

দুটি চোখ—সে যে নিমেষে মুদিয়া আসে,
ঢলি ঢলি পড়ে পরান-প্রিয়ের পাশে—
নিভৃত নিশীথকালে।

সিঁথায় সিঁদুর-রাগ—
গোলাপি ওষ্ঠে দ্বিগুণ শোভিছে তাম্বুল-রাঙা দাগ।
রাঙাপেড়ে শাড়ি, রাঙা রুলি দুটি হাতে,
মর্মরক্ত চরণেরও আলতাতে—
অনুরাগে-রাঙা ফাগ!

লুকানো বনের পাখি—
রূপ দেখি নাই, স্বর শুনি নাই—কী নামে যে তোরে ডাকি?
সবার আড়ালে থাকিয়া সবার সেবা,
দেবরও তোমার দেবতা—নহে বা কেবা,
ফিরো তারও মন রাখি।

অন্তঃপুর কোণে—
কী যে বন্ধনে বাঁধিয়া রেখেছ গুরুজনে পরিজনে!
শিশু-ফুলগুলি তোমারে ঘেরিয়া ফুটে—
স্নেহের উৎস সবারে সমান ছুটে—
বাণীহীন আরাধনে।

নিঃশেষে শুধু দান—
বলীর চেয়েও বলী তুমি—তবু নিরীহ নিরভিমান!
গৃহ-মন্দিরে একক পূজারি তুমি,
তব তর্পণে—সে আজি তীর্থ-ভূমি—
দেবের অধিষ্ঠান।

ওগো বঙ্গের বধূ—
মাধুরী তোমার মোমে-মাখা যেন মৌচাক-ভাঙা মধু।
একে-একে আমি খুঁজেছি সকল ঠাঁই,
নিখিল ভুবনে কোথা হেন হেরি নাই—
গৃহ ধর্মের বঁধু!

অভিমান

ওরে আমার অশ্রুভরা,
ওরে আমার জীর্ণজরা,
ওরে আমার রক্তঝরা প্রাণ।
কার কাছে তুই কবে পেলি,
কোথায় হতে নিয়ে এলি
সৃষ্টিছাড়া এমন অভিমান?
কথায়-কথায় অশ্রু ফুটে,
পায়ে-পায়ে রক্ত ছুটে,
কাঁটায় ভরা এ ধরণীর পথ—
চল্‌তে যখন হবেই তোরে,
এ অভিযোগ মিথ্যা, ওরে!
রিক্ত পথিক, কোথায় পাবি রথ?
বুকের তলে বর্ম পরে,
পায়ের পাতা শক্ত করে
চল্‌তে যে জন জানে জগৎ মাঝে,
এ ধরণীর শ্রদ্ধাভরে
তারেই হেসে বক্ষে ধরে,
তারই শুধু যাত্রা হেথায় সাজে!
অশক্ত-সে ব্যথায় মরে
অশ্রু নিয়ে থাকুক পড়ে—
তারি খেয়া বন্ধ শুধু হবে ;
বিশ্বজগৎ তেম্‌নি ভাবে
তেম্‌নি করেই চলে যাবে,
তারে ডেকে কথাও নাহি কবে!
মান—সে তারে মারবে ঠেলা,
জ্ঞান—সে করবে অবহেলা,
বুদ্ধি তারে চাইবে ঘৃণায় হেসে,
ধনের দম্ভ তেমনি করে
বুকের 'পরে তেম্‌নি জোরে—
চালাবে রথ—তেমনি পাঁজর ঘেঁসে!
হায়রে অন্ধ, হা উন্মত্ত!
এই তো ধরার চরম তত্ত্ব—
এ সত্য কে মিথ্যা করতে পারে?

পুঁথির পাতায় যতই পড়ো,
উদার চিত্র যতই গড়ো—
কথার হাওয়া—ব্যথাই শুধু বাড়ে।
যতই আঘাত করিস্ দ্বারে,
প্রাণের দুয়ার খুল্‌বে নারে ;
হেলায় শুধু শক্তি পূজার পাঠ ;
বুকের ব্যথা, চোখের সলিল,
দুখের কথা, শোকের দলিল—
তাদের লাগি—মুক্ত শ্মশানঘাট!
হয়তো কবে তরুণকালে,
নবীন আশার কিরণজালে,
নূতন চোখের কচি পাতার ফাঁকে—
চেয়েছিলি পরম ক্ষণে,
পেয়েছিলি নয়নকোণে
তরল দিঠি—দরদ বলে যাকে।
কবে যে সেই গ্রামের পারে,
মাঠের শেষে পথের ধারে,
পাগল-করা এমনি মধুমাসে,
উচ্ছ্বসিত শস্যক্ষেতে
চৈত্র হাওয়া উঠ্‌ল মেতে,
অস্তরবি সোনার হাসি হাসে ;
সেইখানে সেই দীঘির পাড়ে,
আধেক-আলো-অন্ধকারে,
কোকিল-ডাকা অশথ-শাখার তলে,
তারি মতন মধুর ডাকে,
কে কী কথা বল্‌ল কাকে—
তাই নিয়ে কি গুমরে মবা চলে?
সন্ধ্যালোকের বর্ণমাখা—
জানিস্ তাহা স্বপ্ন-আঁকা,
এ ধরণীর সত্য তাহা নয় ;
তাই নিয়ে কী বাঁধবি বাসা,
তাই দিয়ে কী করবি আশা,
ওরে পাগল ; তাও কি কভু হয়?
যে অভিনয় খেলায় খাটে,
সাজ্‌বে কী তা ধরার হাটে?
হেথায় শুধু বেচা-কেনাই আছে ;

চোখের জলের মূল্য—কী সে?
হা-হুতাশ তো হাওয়ায় মিশে!
    বুকের ব্যথা বিকাবে কার কাছে?
শক্তিবিহীন রিক্ত নিঃস্ব—
তেমন মানুষ চায় না বিশ্ব,
    বীরের ভোগ্যা বসুন্ধরা, ভাই!
হৃদয়বৃত্তি—দুর্বলতা,
প্রণয়—সে তো কথার কথা,
    মানের মূল্য—অভিমানের নাই!

নিষ্কৃতিহীন

ওগো, যে পল্লীতে বসত আমার—নিত্য সেথায় সাঁঝে
    ঘরে-ঘরেই, সন্ধ্যারতির শঙ্খঘণ্টা বাজে!
শুধু আমার ঘরেই হায়!
কোনো উপকরণ নাই—
তবু তাদের পূজার শঙ্খে আমার চমক ভেঙে যায়—
তাই সবার সাথে পূজি আমার প্রাণের দেবতায়!

ওগো, যে পাড়াতে কুটির আমার—নিত্য সেথায় রাতে
    ঘরে-ঘরেই শিশুর কান্না লেগেই আছে সাথে—
শুধু আমার ঘরেই, হায়!
তারা অনেক দিনই নাই—
তবু যখনি কেউ কাঁদে আমার তন্দ্রা ভেঙে যায়—
তাই সকল মায়ের সঙ্গে জাগি শিশুর বিছানায়।

    শিশুহারা লক্ষ্মীছাড়া—এমনি আমার ঘর—
    তবু কেন পাই না ছুটি, হে জীবনেশ্বর!

শিব-সপ্তক

কে বলে তুমি উদাসী শিব, কে বলে তুমি সন্ন্যাসী—
    কে বলে তুমি সংহারের দেবতা ;
কে বলে সদা ব্যস্ত যোগে—ত্রিলোকে কভু সম্ভাষি
    শুধাও নাকো কাহারে কোনো বারতা?

প্রলয় জলে মগ্ন করি দহিয়া মহাখাণ্ডবে
বিশ্ব নাকি লুপ্ত কর হেলাতে,
অঙ্গে সেই ভস্ম মাখি নৃত্য কর তাণ্ডবে—
তোমার সুখ রুদ্র সেই খেলাতে!
ধ্বংসে আর বিনাশে হর, তোমার নাম লিপ্ত যে,
শক্তি তব ব্যক্ত শুধু নাশিতে,
ত্রিশূলে যে-বা বিদ্ধ করে—সর্বনাশা ক্ষিপ্ত যে—
সে কভু কারে পারে কি ভালোবাসিতে?
বিশ্বনাথ, ইহার চেয়ে বিকট কোনো কল্পনা
মর্ত্যজীবে পারে না কভু ভুলাতে,
শিবেরে যে-বা অশিব করে, সাধ্য তার অল্প না,
কৈলাসে সে লুটাতে পারে ধুলাতে!

পতিত জনে পাবন তরে ধরিলে তুমি গঙ্গাধর
জহ্নুসুতা মৌলিজটাকটাহে,
ত্রিপুরে নাশি শম্ভু তুমি আর্ত-সুর-শঙ্কা-হর,
ললাটে শোভে শিশু-শশীর ছটা হে।
ঐরাবতে ইন্দ্রে দিয়া, লক্ষ্মী দিয়া বিষ্ণুরে,
কৌস্তুভেতে ভূষিয়া তাঁরি উরসে,
সিন্ধুবারিমথনদিনে দেব-দানবনিষ্ঠুরে
অমৃতরাশি কে দিল হাসি হরষে?
কণ্ঠ'পরে দারুণ জ্বালা ধর গরল ভক্ষণে,
সবার শুভ তোমার ধ্রুব কামনা,
সর্প তাই বক্ষভূষা—সর্বজনরক্ষণে।
সতত তব জীবন-পণ সাধনা।
নিখিল তরে অন্নদারে সঁপিয়া নিজে ভিক্ষাসার,
মুষ্টিদান—দু-বেলা তাও জোটে না ;
লজ্জাবাস বিলায়ে সবে দিগ্বসনে দীক্ষা কার—
কৃত্তিবাস—কভু বা তাও মোটে না।

জননী যেথা বুকের ধন নয়নমণি নন্দনে
রাখিয়া যায় পাষাণে বাঁধি হিয়া সে,
রমণী যেথা ত্যজিয়া যায় জীবনমনবন্ধনে—
দায়িতে তার চিরবিদায় দিয়া সে ;
যেখানে যায় কেহ আছে, শেষের সেই রাত্রিতে
বিন্দু দুই চোখের জল ফেলিয়া,
প্রণয়ী বল বন্ধু বল—পরপারের যাত্রী যে—
সঙ্গ তার ছাড়িয়া যায় চলিয়া ;

গৃধিনীশিবাসেবিত সেই শ্মশানপুরসংকটে,
কাঁদিয়া চিতাভস্ম কয়—কে আছে?
অমনি তার শিয়রে আসি শ্মশানবাসী সঙ্করে
মাভৈঃ রবে অভয়বাণী দিয়াছে।
কে বলে তোরে ছেড়েছে সবে। মেল্‌রে আঁখি মুগ্ধ নর,
দেখ্‌রে চেয়ে কে আছে কাছে দাঁড়ায়ে,
তোদেরি লাগি সেজেছি আমি ভূতভাবন ভস্মধর
তোদেরি লাগি রয়েছি বাহু বাড়ায়ে।

বক্ষে আমি টানিয়া লই নিমেষতরে বঞ্চিয়া,
ধরার ধারা নূতন করে গড়িতে,
জীর্ণ ওই জন্মফলে নবীন সুধা সঞ্চিয়া,
নূতন রূপে নূতন রসে ভরিতে ;
মায়াতে তোরা ভাবিস্ ভবে মৃত্যু বুঝি দুঃশাসন—
নিঃশেষিয়া পরানবাস হরিবে,
বসন—সে যে আমারি হাতে, আমারি বরে আচ্ছাদন
নূতন হয়ে নিয়ত তোরে বরিবে।

রাত্রি এসে হরিতে চায় দিনের দাহ দীপ্তি যে,
দিন কী তায় মরিয়া যায় ফুরায়ে?
ক্লান্তি 'পরে শান্তি শুধু সাধিয়া তার তৃপ্তি যে
নবন তেজে উষারে দেয় ঘুরায়ে।
অরণ্যের হারানো পাতা বসন্তের সম্পদে
ফিরায়ে তাই আনিতে এই আয়োজন,
অর্ধনারীমূর্তি—তবু নবীন সুখ-সঙ্গতে
আমারো দেখ্ উমারে পাওয়া প্রয়োজন।

নিয়ত জরা-মরণ-ভরা বিপুল এই বিশ্বেতে,
হে পরমেশ, করুণা তব সব ঠাঁই,
বিভূতিধরা বিরাট বুকে ধনীতে আর নিঃস্বেতে
দুঃখী সুখী—কাহারো কোনো ভেদ নাই।
ব্যাধিতে জীব বেদনা পায়, তাইতো তুমি বৈদ্যনাথ,
আয়ুর্বেদ বিধান দিলে তাহারে,
দুঃখদিনে শরণ লয় বৃদ্ধ যুবা সদ্যোজাত,
রোগের ভোগ ছাড়েনা কভু কাহারে।
জীবন যাচে প্রসাদ তব, মরণে তব অঙ্ক চায়—
বাসনা তাই গঙ্গা আর কাশীতে,
কত না নদী-নগরী আছে, কে ডাকে কারে বন্দনায়
কোথায় আর চাহে বা জীব আসিতে?

বোঝে না তুমি জগৎময়, দেখিতে চায় মন্দিরে,
মুরতি তব গড়িয়া মাটি-পাষাণে,
যে ব্যোম-ব্যোম ধ্বনিছে ব্যোমে—তাহারে করি বন্দীরে,
ঢক্কারবে বিষাণে ডাকে ঈশানে।

সতীর শোকে পাগল হয়ে যেদিন তুমি ধূর্জটি,
স্কন্ধে শব—ফিরিলে সারা ভুবনে,
ত্রি-আঁখি আলো নিভিয়া গেল, বিশ্বময় কুজ্ঝটি,
লুপ্ত প্রায় সৃষ্টি তব রোদনে ;
মুণ্ডপরা খড়্গধরা ভৈরবী সে চণ্ডিকা
উঠিলা যবে করাল রণে মাতিয়া,
রক্তস্রোতে সৃষ্টি ভাসে, ফিরে না তবু অম্বিকা,
তুমি সে তারে থামালে বুক পাতিয়া।
নির্বিকার, তবু যে তুমি তারকাসুরে দণ্ডিতে
কুমারতরে বরিলে ফিরে উমারে,
মন্মথেরে নাশিলে তুমি রূপের মোহ খণ্ডিতে—
সাধনা দিয়ে পাওয়ালে শেষে তোমারে।
নয়ন নিয়ে প্রণয় নয়, দেখালে তুমি সংযমে,
সিদ্ধি তার সাধ্য কার নাশিতে,
তাইতো নারী শিবের মতো পতিরে চায় সম্ভ্রমে,
তোমার মতো কে পারে ভালোবাসিতে?

ত্যাগের তুমি মূর্তি প্রভু, ত্যাগ যে তব কণ্ঠহার,
হাড়ের মালা পরেছ তাই গলাতে,
ভস্ম তব বক্ষভূষা—বিশ্ব শুধু ভস্মসার,
তাই তো তারে বরেছে সেই ছলাতে!
রত্নধন সবে তো লয় ভুবনময় অন্বেষি
হস্তি-হয়ে সবারি চিরকামনা,
বৃষভে কেহ চাহে না তাই নিয়েছ তারে সন্ন্যাসী,
হে মহাকাল, চলেছ ধীরে—থাম না!
বংশী-বীণ শোভে ক-দিন, ক-দিন কাটে সংগীতে,
সজ্জা সাজ ক-দিন রাখে ভুলায়ে,
শেষের ডাক মহাপিনাক, তাই সে তব সঙ্গী যে—
ডমরুধর—ডাকিছ জীবে কুলায়ে!
আপন ভয়ে দেখে যে লোক তোমারে শুধু সংহারে,
ভক্ত কাছে তুমি যে শিব ভোলানাথ,
তোমার মতো এমন সখা পাব কী আর সংসারে—
হে আশুতোষ, চরণে শত প্রণিপাত!

অন্ধবধূ

পায়ের তলায় নরম ঠেক্‌ল কী!
আস্তে একটু চল্‌ না ঠাকুর-ঝি—
        ওমা, এ যে ঝরা-বকুল! নয়?
তাইতো বলি, বসে দোরের পাশে,
রাত্তিরে কাল—মধুমদির বাসে
        আকাশ-পাতাল—কতই মনে হয়।

জ্যৈষ্ঠ আসতে ক-দিন দেরি ভাই—
আমের গায়ে বরণ দেখা যায়?

—অনেক দেরি? কেমন করে হবে!
কোকিল-ডাকা শুনেছি সেই কবে,
        দখিন হাওয়া—বন্ধ কবে ভাই;
দীঘির ঘাটে নতুন সিঁড়ি জাগে—
শ্যাওলা-পিছল—এমনি শঙ্কা লাগে,
        পা-পিছলিয়ে তলিয়ে যদি যাই!

মন্দ নেহাত হয় না কিন্তু তায়—
অন্ধ চোখের দ্বন্দ্ব চুকে যায়!

দুঃখ নাইকো সত্যি কথা শোন্‌,
অন্ধ গেলে কী আর হবে বোন?
        বাঁচবি তোরা—দাদা তো তোর আগে?
এই আষাঢ়েই আবার বিয়ে হবে,
বাড়ি আসার পথ খুঁজে না পাবে—
        দেখবি তখন—প্রবাস কেমন লাগে?

—কি বল্লি ভাই, কাঁদবে সন্ধ্যা-সকাল?
হা অদৃষ্ট. হায়রে আমার কপাল!

কত লোকেই যায় তো পরবাসে—
কাল-বোশেখে কে না বাড়ি আসে?
        চৈতালি কাজ, কবে যে সেই শেষ।
পাড়ার মানুষ ফিরল সবাই ঘর,
তোমার ভায়ের সবই স্বতন্তর—
        ফিরে আসার নাই কোনো উদ্দেশ!

—ওই যে হেথায় ঘরের কাঁটা আছে—
ফিরে আসতে হবে তো তার কাছে।

এই খানেতে একটু ধরিস্ ভাই,
পিছল ভারি—ফস্‌কে যদি যাই—
এ অক্ষমার রক্ষা কী আর আছে!
আসুন ফিরে—অনেক দিনের আশা,
থাকুন ঘরে, না থাক্ ভালোবাসা—
তবু দু-দিন অভাগিনীর কাছে!

জন্মশোধের বিদায় নিয়ে ফিরে—
সেদিন তখন আসব দীঘির তীরে।

'চোখ গেল' ওই চেঁচিয়ে হল সারা।
আচ্ছা দিদি, কী করবে ভাই তারা—
জন্ম লাগি গিয়েছে যার চোখ!
কাঁদার সুখ যে বারণ তাহার—ছাই!
কাঁদতে পেলে বাঁচত সে যে ভাই,
কতক তবু কম্‌ত যে তার শোক!

'চোখ গেল'—তার ভরসা তবু আছে—
চক্ষুহীনার কী কথা কার কাছে!

টানিস্ কেন? কিসের তাড়াতাড়ি—
সেই তো ফিরে যাব আবার বাড়ি,
একলা-থাকা-সেই তো গৃহকোণ—
তার চেয়ে এই স্নিগ্ধ শীতল জলে
দুটো যেন প্রাণের কথা বলে—
দরদ-ভরা দুখের আলাপন ;

পরশ তাহার মায়ের স্নেহের মতো
ভুলায় খানিক মনের ব্যথা যত।

এবার এলে, হাতটি দিয়ে গায়ে
অন্ধ আঁখি বুলিয়ে বারেক পায়ে—
বন্ধ চোখের অশ্রু রুধি পাতায়,
জন্ম-দুখীর দীর্ঘ আয়ু দিয়ে
চির-বিদায় ভিক্ষা যাব নিয়ে—
সকল বালাই বহি আপন মাথায়।—

দেখিস্ তখন, কানার জন্য আর
কষ্ট কিছু হয় না যেন তাঁর।

তারপরে—এই শ্যাওলা-দীঘির ধার—
সঙ্গে আসতে বলবনাকো আর,
শেষের পথে কিসের বল ভয়—
এইখানে এই বেতের বনের ধারে,
ডাহুক-ডাকা সন্ধ্যা-অন্ধকারে—
সবার সঙ্গে সাঙ্গ পরিচয়।

শ্যাওলা দীঘির শীতল অতল নীরে—
মায়ের কোলটি পাই যেন ভাই ফিরে?

কেয়াফুল

ফুল চাই—চাই কেয়াফুল!—
সহসা পথের 'পরে
আমার এ ভাঙা ঘরে
কণ্ঠ কার ধ্বনিল আকুল!

তখনো শ্রাবণ-সন্ধ্যা
নিঃশেষে হয়নি বন্ধ্যা—
থেকে-থেকে ঝরিতেছে জল ;
পবন উঠেছে জেগে,
বিজলি ঝলিছে বেগে—
মেঘে-মেঘে বাজিছে মাদল।

জনহীন ক্ষুব্ধ পথ
জাগিছে দুঃস্বপ্নবৎ—
বুকে চাপি আর্ত অন্ধকার;
কোনো মতে কাজ সারি
যে যার ফিরেছে বাড়ি,
ঘরে-ঘেরে বন্ধ যত দ্বার।

সঙ্গীহীন শূন্য-ঘরে
হিয়া গুমরিয়া মরে
স্মরি যত জীবনের ভুল;

অকস্মাৎ তারি মাঝে
ধ্বনি কার কানে বাজে—
চাই ফুল—চাই কেয়াফুল!

পাগল! আজি এ রাতে,
এ দুর্যোগ-অভিঘাতে—
বৃষ্টিপাতে বিলুপ্ত মেদিনী;
তার মাঝে কেবা আছে,
কেতকী-সৌরভ যাচে!—
কোথায় বা হবে বিকিকিনি?

পবন উঠিছে মাতি!
কিছুক্ষণ কান পাতি'
মনে হল গিয়াছে বালাই;
সহসা আমারি দ্বারে
ডাক এল একেবারে—
ফুল চাই—কেয়াফুল চাই!

ভাবিলাম মনে-মনে—
হয়তো বা এ জীবনে
কোনোদিন কিনেছিনু ফুল;
সেই কথা মনে করে
আজো বা আশায় ঘোরে;
কিম্বা কারে করিয়াছে ভুল!

তাড়াতাড়ি আলো তুলি
বাহিরিনু দ্বার খুলি,
সবিস্ময়ে দেখিলাম চেয়ে—
মাথায় বৃহৎ ডালা,
দাঁড়ায়ে পসারি-বালা—
শ্রাবণ ঝরিছে অঙ্গ বেয়ে!

কহিলাম, এ কী কাণ্ড!
তোমার পসরাভাণ্ড
আজ রাতে কে কিনিবে আর?
এ প্রলয়ে কারো কাছে
কিছু কি প্রত্যাশা আছে—
কেন মিছে বহিছ এ ভার!

আর্দ্র দেহে আর্দ্র বাসে
সে কহিল মৃদু হাসে—
শিরে বায়ু সুগন্ধ ছড়ায়—
যে ফুলে বেসাতি করি,
বাদল-যে শিরে ধরি;—
কপালে লিখিল বিধি তাই!

বহিয়া দুখের ঋণ
যে কষ্টে কাটাই দিন—
এ দুর্দিন কিবা তার কাছে?
—ওগো তুমি নেবে কিছু?
নয়ন হইল নিচু—
সেথাও বা মেঘ নামিয়াছে!

খোলা দরজার পাশে
বায়ু গরজিয়া আসে,
ফুলবাসে ভরি দেহ মন;
ঝর-ঝর ঝরে জল,
আঁখি করে ছল-ছল
ঘনাইয়া প্রাণের শ্রাবণ।

বাদলের বিহ্বলতা—
বুঝি হায়। লাগিল তা
নয়নে বচনে সর্ব দেহে!
সহসা চাহিয়া আড়
রমণী ফিরাল ঘাড়—
ঊর্ধ্বে যেন কী দেখিবে চেয়ে!

না কহিয়া কোনো বাণী
পসরা লইনু টানি—
মূল্য তার হাতে দিনু যবে,
উজাড় করিতে ডালা
কাঁদিয়া ফেলিল বালা—
ওমা এ কী—এত কেন হবে!

কহিনু—যা কিনিলাম,
এ নহে তাহারি দাম—
প্রতিদিন দিতে হবে মোরে;

এক পণ দুই পণ—
যেদিন যেমন মন;
তাহারি আগাম দিনু তোরে।

কতক বুঝে না-বুঝে
হৃদয়ের ভাষা খুঁজে—
বহু কষ্টে জানাইয়া তাই,
পুষ্পগন্ধে মোরে ঘিরে
অন্ধকারে ধীরে-ধীরে
পসারিনী হইল বিদায়।

ফিরিনু একলা-ঘরে—
বাদল তখনো ঝরে,
পুষ্পগন্ধে পূর্ণ গৃহতল;
শয্যা লইলাম পাতি,
নিবায়ে দিলাম বাতি—
আবার আসিল বেগে জল!

রুদ্ধ জানালার ফাঁকে
বাতাস কাহারে ডাকে,
বিজলি চমকি কারে চায়!
কোন্ অন্ধ অনুরাগে
ত্রিযামা যামিনী জাগে
শ্রাবণ-ব্যাকুল-ব্যর্থতায়!

সঙ্গীহীন শূন্য ঘরে
হিয়া গুমরিয়া মরে—
স্মরিয়া এ জীবনের ভুল;
সেই সাথে থেকে-থেকে
মনে হয়—গেল ডেকে
কাননের যত কেয়াফুল!

পদ্মাতীরে

পদ্মাতীরে পড়ে এল বেলা;
কলকোলাহলক্লান্ত দিবসের মেলা

সন্ধ্যার মেঘের সাথে—
তন্দ্রা স্তব্ধতাতে,
মিলাইয়া এল ধীরে
ধরিত্রীর তীরে;
তটতরুদল
দক্ষিণের পরশনে পুলক-বিহ্বল,
দিবসের ক্লান্তিশেষে,
স্বপ্নাবেশে
ফিরে যেন পেল আপনারে;
তীরে-নীরে নদীপারে-পারে
জাগিল মর্মর কথা—
আনন্দ-উচ্ছল গীতি—ভাষাহীন কলমুখরতা;
তীরাস্তৃত বালুকার রাশি
মৃদুহাসি
শুল পাশ ফিরে—
ঝিল্লির ঝালর-দেওয়া অন্ধকারে অঙ্গখানি ঘিরে।
হেরিনু অসংখ্য ঊর্মি সম্মুখেতে চলিয়াছে ধেয়ে—
সারে-সারে সারিগান গেয়ে;
উদ্দাম উৎসাহমত্ত উদ্বেল-চঞ্চল—
পারাবার তীর্থযাত্রীদল
চলিয়াছে চিররাত্রিদিন—
সুদূর লক্ষ্যের পানে নেত্র রাখি নিমেষবিহীন।
কি জানি কেমনে
সহসা হইল মনে,
আলোছায়া-ঝিকিমিকি সেদিনের ফাল্গুনের সাঁঝে—
ওই তরঙ্গের মাঝে নিখিলের ধারা-যন্ত্র বাজে!
পরস্পর
আঁকা-বাঁকা আলো-কালো উঁচু-নিচু প্রভেদ বিস্তর;
নির্বিবাদে তবু পাশাপাশি—
একস্তরে কোটি সঙ্গী সকৌতুকে চলে কলহাসি;
চেয়ে তারি পানে—
উর্ধ্বে চলে মেঘমালা সেই সাথে অজানা উজানে!

মনে হয় হেরি ওই ঊর্মিমালা, প্রাতঃসূর্যকরে—
আলোকের কলহংস ভেসে যায় কেন কলস্বরে
লক্ষ লক্ষ শুভ্র পক্ষ মেলি;
স্বর্ণাঙ্কিত-চেলি,

সায়াহ্নের বর্ণ-ভাঙা রাঙা অন্ধকারে,
যেন তারা উড়ে চলে পারে—
গৈরিক তরঙ্গ আঁকি
চক্রবাকী
যেন সারে-সারে—
গায়ে-গায়ে হাজারে-হাজারে;
কাজল-তিমিরে
রজনী ঘনায় ধীরে—
ঊর্মিপুঞ্জে অন্ধকার—পানকৌড়ি ডুব দেয় নীরে!
শুধু শোনা যায়
মর্মরিত বারি-রাশি—যেন এ মর্মেরি কিনারায়!
অনন্তের-কালস্রোত তারি পানে চেয়ে
সেতার মিলায় তার ওই সুরে গান গেয়ে-গেয়ে;
চেয়ে তারি পানে
বিশ্বের অব্যক্ত বাণীধ্বনি উঠে কথাহীন গানে!
দিনে রাতে
হেরি তারি সাথে—
অলক্ষিত লক্ষ ঊর্মিদল,
শব্দে গন্ধে রূপে ছন্দে স্পন্দমান নিয়ত চঞ্চল;
আকাশের তারা—
মহাশূন্যে মালা গেঁথে চলিয়াছে চির-শ্রান্তি-হারা,
প্রাণ-পরিবাহ
অনুদিন অক্লান্ত-উৎসাহ—
অসংখ্য জীবের মাঝে দেশে-দেশে চলিয়াছে ছুটে;
বীজ রেখে ফল যায় টুটে—
সেই বুজে ফল ফের ফলে,
জীবন-প্রবাহ এঁকে সৃষ্টিমাঝে শূন্যে স্থলে জলে;
শৈল-শৃঙ্গে পৃথ্বীগাত্রে মৃত্তিকার 'পরে—
ওই তরঙ্গেরি রেখা স্তবকে-স্তবকে স্তরে-স্তরে;
চলে বিশ্ব-তরঙ্গের শ্রেণী—
অস্পষ্ট কোথাও স্পষ্ট—আন্দোলিত অনন্তের বেণী!

ওই ঊর্মিহার,
অনাদি যুগের লক্ষ অজানিত অক্ষরের সার—
বাক্যে-রসে ভরি উঠে ধীরে,
শুনায় অখণ্ড-গীতি নিতি-নিতি অমৃতের তীরে;
ওই ঊর্মিমালা—
প্রভাতে-সন্ধ্যায় নিত্য সাজাইছে ডালা

অসীমের পদে,
ভেসে-যাওয়া অর্ঘ্য রচি কুমুদে-কহ্লারে-কোকনদে;
ওই রস-তরঙ্গের ধারা
আপনি সর্বস্বহারা অপারের খুঁজিছে কিনারা;
লক্ষ্যে স্থির গতিতে চঞ্চল
অনন্ত পথের পান্থ শুধু কহে—চল্ চল্ চল্!
হে নিয়তি দ্বিধাহীন গতি!
আজি কবি পাঠায় প্রণতি
তোমার লক্ষ্যের পানে—
তব মাঝখানে;
তোমার যাত্রার বার্তা কহ আজি সবে-
শক্তিমত্ত মোহান্ধ মানবে:
পূর্ব হতে পশ্চিমের পানে,
শুনাও সকল বর্ণে, জাতি-ধর্মে প্রত্যেকের কানে—
তোমার প্রশান্ত মন্ত্রবাণী—
স্বার্থে নয় দ্বন্দ্বে নয়—ঐক্যে শুধু লক্ষ্য বলি মানি!
অনন্তের পথে
জলে-স্থলে নাহি ভেদ, নাহি বাধা সমুদ্রে-পর্বতে;
বিচিত্র ছন্দের মধ্য দিয়া
অসীমের সাম্য-সাম অবিশ্রাম উঠিছে ধ্বনিয়া—
সেতারের তারে-তারে যথা
সুরে-সুরে ঘুরে-ঘুরে পূরে উঠে গানের পূর্ণতা;
তরঙ্গের ভঙ্গির বিভেদ—
সে ধ্রুবযাত্রার পথে নহে বিঘ্ন নহে প্রতিষেধ;
এক লক্ষ্য সচঞ্চল তরঙ্গের দল।
নিশিদিন কলস্বরে তাই বলে—চল্ চল্ চল্।

বাঁশিওয়ালা

ওগো বাঁশিওলা, এই বাড়ি এস—আধেক-জানালা-ফাঁকে,
কোমল মধুর কণ্ঠে ষোড়শী ডাকিল ফেরিওলাকে;
অঙ্কে তাহার ফুটফুটে মেয়ে—তারি পানে বাহু মেলি
তৃতীয়ার শশী আসিবে যেন সে আকাশের কোল ফেলি।

বৈশাখী দিবা—দ্বিপ্রহরের আলোক-পাপড়িগুলি
একে-একে যেন হেলায় ফাটিয়া এলায়ে পড়িছে খুলি;
নিথর নিঝুম—তন্দ্রা-আহত নীলের বক্ষ চিরে
ক্লান্ত-করুণ-চিলের কণ্ঠ আকাশে ধ্বনিয়া ফিরে!

হেনকালে পথে তীব্র মধুর বাঁশির আর্তনাদ
মধ্য-দিনের সমাধি-স্বপ্নে সহসা সাধিল বাদ;
ঘরে-ঘরে-ঘরে শিশু-গোপীদলে অমনি পড়িল সাড়া—
কালা নাই—তবু বাঁশরির স্বরে তোলপাড় সারা পাড়া!

শিরে বহি বোঝা বাঁশিটি ধরিয়া শীর্ণ দু-খানি হাতে,
ফুৎকারে দুটি ফুলাইয়া গাল সুবিপুল চেষ্টাতে—
পথ দিয়া বুড়া বাজায়ে চলেছে—আঁখি রাখি চারিভিতে—
ওগো, এই বাড়ি—ডাকিল তরুণী সুমধুর ভঙ্গিতে।

দুই হাত দিয়ে পসরা নামায়ে পসারি ঢুকিল দ্বারে,
অন্ধের মতো ক্ষণেক সহসা দাঁড়াল অন্ধকারে;
বক্ষ ভেদিয়া উঠিল যে ধ্বনি দীর্ঘশ্বাসের মতো—
লক্ষ্য করিলে বুঝিবে নিমেষে ক্লান্তি যে তার কত!

ভালো বাঁশি আছে—শুধাল তরুণী—শিশু-মুখে হাসি ফুটে;
বা'র কর দেখি—কচি মুখে যাহা আপনি বাজিয়া উঠে;
টুকটুকে ওই ঠোঁটের মতন টুকটুকে হওয়া চাই—
মূল্যের লাগি ভাবিয়ো না কিছু—যা চাহিবে দিব তাই।

পণ্যের ভার নামাইতে বুড়া—আপনি পড়িল নুয়ে—
শুষ্ক কণ্ঠে 'মা' বলিয়া ডাকি বসিয়া পড়িল ভুঁয়ে!
একটু জল কী পাই মা জননী—তৃষ্ণায় ফাটে ছাতি—
তরুণীর পানে চাহিল বৃদ্ধ ঊর্ধ্ব-নয়ন পাতি!

'মা' বলে ডাকিতে, বাকি ছিল যাহা মায়ের নিভৃত প্রাণে—
উছলি উঠিল অমৃত-সিন্ধু চাহিতে মুখের পানে ;
মেয়েরে নামায়ে তাড়াতাড়ি উঠে ছুটে গিয়ে ঘর থেকে
সুশীতল জল, সাথে কিছু তার—সম্মুখে দিয়া রেখে,

মধু নিঙাড়িয়া কহিল—আহাহা! রোদটা লেগেছে ভারি!
খেয়ে ফেল বাছা—জননী-কণ্ঠে ঝরিল অমৃত-ঝারি!
অমনি সঙ্গে ইঙ্গিত করি মোহন ভঙ্গিমাতে—
'কেয়ে প্যাল' বলি প্রতিধ্বনিটি জাগিল যেন রে সাথে!

স্নেহের সে দানে লভিয়া জীবন—বালিকার পানে চাহি
মুগ্ধ যেন সে রহিল বৃদ্ধ—নয়নে নিমেষ নাহি ;
মুখে নাহি বাণী—সংকোচে টানি লইল তাহারে বুকে—
সিন্ধুর কোলে ধরা দিল শশী আনন্দে কৌতুকে!

কোথায় পসরা, কোথায় বেচা-কেনা—কিছু নাই, নাহি কেউ,
অকূলের কূলে আছাড়িয়া মরে দু-কূল-হারানো ঢেউ ;
কোন্ সুদূরের কোন্ ছবিখানি কবেকার কেবা জানে—
অতলের তলে কোন্ ছলে আজি বাড়ব-অগ্নি হানে।

সূর্য তখনো রুদ্র প্রদীপ ঘুরায়ে গগন-থালে,
বিশ্বনাথের মন্দিরতলে দীপ্তির ধারা ঢালে ;
বাজে অমূর্ত প্রহর-ঘণ্টা ডিণ্ডিমে তাল রাখি—
মুখর মেদিনী ভয়নির্বাক মেলি বিস্মিত আঁখি।

বয়ে যায় বেলা, কাজ আছে মেলা—রমণী ডাকিল তারে—
স্বপ্নাবিষ্ট চকিতে উঠিয়া বসিল অন্ধকারে!
তাড়াতাড়ি খুলি বৃহৎ পুঁটুলি—হাতাড়িয়া তলদেশে—
টকটকে রাঙা অপূর্ব বাঁশি বাহির করিলা শেষে!

তিরি-রিরি-রিরি—বাজিল বাঁশরি কচি মুখে চুমু খেয়ে ;
বিস্মিত বুড়া—কাঙাল যেন সে মানিক কুড়ায়ে পেয়ে!
মহা আনন্দে হাততালি দিয়া হাসি-মুকুলিত মুখে
সিন্ধুর শশী ঝাঁপায়ে পড়িল আকাশের শ্যাম বুকে।

কত দাম হবে—শুধাল জননী, হরষিত আঁখি তুলি—
বৃদ্ধ তখনো বালিকার পানে চেয়ে আছে সব ভুলি।
দাম কত এর—শুধাইল ফিরে—পসরা বাঁধিতে তার,
বৃদ্ধের বাহু উঠিল কাঁপিয়া—নয়নে অশ্রুধার!

মাপ কর মোরে—টিনের বাঁশির কত বা হইবে দাম!
'সেলামি' বলিয়া মায়েরে আমার আজি উহা সঁপিলাম।
হিয়ার মাঝারে কী যে আজি করে—কেমনে বুঝাব বলে—
দশগুণ দাম পেয়েছি যখনি মায়েরে করেছি কোলে।

ওমা! সে কী কথা—গরিব মানুষ, দুঃখের কড়ি তব—
মুখের অন্ন—অমন করিয়া কেমনে কাড়িয়া লব?
এস যেয়ো—পথে, দেখে-শুনে যেয়ো—এমনি সে চিরদিন,
ঋণদায়ে আর জড়িয়ো না মোরে—সে যে বড় সুকঠিন।

ছাড়িয়া মায়েরে খুকি আজি দূরে—বাঁশি যে তাহার সাথী—
বুলবুল যেন শিস দিয়ে ফিরে সুরের নেশায় ম্যাতি!
তিরি-রিরি-রিরি বলিছে বাঁশরি—অমনি হাসিটি মুখে—
আনন্দ যেন উছলি উঠিছে উৎসাহে-কৌতুকে।

প্রাণ তুমি মোরে দিলে যে আজিকে—সেকি নহে মোর ঋণ—
প্রাণের বদলে ছোট বাঁশিটাও দিতে কি পারে না দীন?
দরিদ্র বটে, তবু যে আমার ছিল মা—অমনি মেয়ে—
সেই মুখ আজ মনে পড়ে গেছে ওই মুখখানি চেয়ে!

থামিল বৃদ্ধ—কণ্ঠ তাহার গদ্‌গদ করুণায়
অশ্রু-বাষ্প ফিরিয়া-ফিরিয়া নেত্র ভরিয়া যায়।
জননীর স্নেহ-অশ্রু-সাগরে—সেথাও ডেকেছে বান—
পসারির শিরে হাত রাখি কহে—তুই মোর সন্তান!

রুধির যেদিন ক্ষীর হয়ে আসে—রমণী সেদিন মাতা,
নয়নবহ্নি মেঘ হয়ে যবে আবরে আঁখির পাতা ;
তরঙ্গ যবে রঙ্গ ছাড়িয়া হয়ে উঠে রসধারা—
বিশ্বে সে দিন সুন্দর হয় শিবের মাঝারে হারা।

মেয়ে মনে ভাবে—এ কী হল আজ, বুড়া কেন নাহি যায়—
তাই—ধীরে-ধীরে মার পানে আর তার পানে ফিরে চায়।
পাওনা যা—তাহা পাওয়া কি হইল, দেনা কি রহিল দেনা—
খেলার পসরা বিনিময়ে আজ মমতার বেচাকেনা!

সন্ধ্যা ঘনায়ে এসেছে তখন—রাঙা রবি গেছে পাটে—
কী পসরা আজ বেচিলে পসারি, হারানো হিয়ার হাটে?
হারায় যা তাহা যায় ফিরে পাওয়া—ও শুধু বাড়ানো দুখ—
বার-বার হায়! সেই ব্যথা পেতে, তবু মন উৎসুক!

ভক্তির জয়

প্রাচীরের কোণে চাঁপার গাছটি
ফুল-ফোটা করি সারা—
শীতের শাসনে হাত জোড় করি
দাঁড়ায়ে রয়েছে খাড়া!
নূতন মুকুল ভয়ের তাড়ায়
বাহির হয় না বড়,
কুঁড়ি ছিল যারা, সঙ্কোচে সারা—
সন্দেহে জড়োসড়ো,
একটি বা দুটি ভোরের আঁধারে
মুখখানি করে বা'র—
এতই গোপনে, পাতার আড়ালে
খুঁজে পাওয়া তারে ভার!
সেই ফুল দিয়ে শিবের মাথায়
কোনো মতে সেবা সারি
গাছ পানে চেয়ে ক্ষুণ্ণ হৃদয়ে
প্রতিদিন ফিরি বাড়ি।
শাখাগুলি যেন বুকের পাঁজর,
কাঙাল বাসনারাজি—
তারি মাঝে যেন ফুল হয়ে ফুটে
সাজায় প্রাণের সাজি!

বাড়ির মালেক—মহাজন শেঠ
একই নগরে বসে ;
টাকার যক্ষ—লক্ষ ধনীর
মূর্তিমন্ত ত্রাস!
তিনি নাকি, শুনি, পূজিবেন শিবে
মনোমতো মাগি বর,
কে যেন বলেছে—মহেশ্বরের
প্রিয় সে নাগেশ্বর!
বহুদূর মাঝে আর গাছ নাই,
এক গাছ মোর আছে,—

প্রত্যুষে তাই লোক এসে তার
ফুল চাহে মোর কাছে।
কহিলাম ধীরে, ফুলের সময়
নহে তো এখন আর—
একটি মাত্র ফুটেছিল আজি—
সেও মোর দেবতার।
বাহু-আস্ফোটে জানায়ে গেল সে,
থাকিবে না হেন 'বাড়'—
হাসিলাম শুধু—কথা মোর কিছু
ছিলনাকো বলিবার।

দণ্ড দুয়েক বেলা সে তখন,
স্নানান্তে সাজি-হাতে
পূজা উদ্দেশে চলিয়াছি পথে
শিহরি শিশির বাতে।
মন্দির দ্বারে কহিল প্রহরী,
প্রবেশের মানা আছে!
বুঝিনু নিমেষে ; শুধানু—আদেশ
পেয়েছ কাহার কাছে?
মৃদু হাসি ধীরে চলি গেল দ্বারী ;
সহসা সমুখে দেখি—
বহু লোকজন শকট অশ্ব
বহি পূজাভার—একি!
অদূরে বাজিয়া উঠিল বাদ্য,
পিছনে উচ্চ যানে
মহাজন শেঠ! ভ্রূকুটি-নেত্রে
চাহি মোর মুখপানে,
প্রবেশিল গিয়া মন্দির মাঝে
বন্ধ হইল দ্বার,
বিস্ময়ে দূরে দাঁড়ায়ে দেখিনু
কাণ্ড সে দেবতার!

জুড়ি চারিধার গগন-বিদার
জয়-জয়কার ধ্বনি!
হাজার কণ্ঠ হাঁকি কয়, জয়!
ভক্তের শিরোমণি!
বহুদিন হেন পূজা উপচার
পড়েনি দেবের দ্বারে ;

বাহিরিল ধনী—লুটায়ে অমনি
শতশির সারে-সারে
প্রণমিল তারে ; শিবের দুয়ারে
লুটায় না ততো শির!
ফিরিল ভক্ত—জয়শেষে যেন
দৃপ্ত বিজয়ী বীর,
গর্বিত মুখ—ভক্তিতে বুঝি,
উন্নত মাথা তুলি ;
কহে পুরোহিত—শিবের দুয়ারে
ইন্দ্রের পদধূলি!
লোকজন যত ফিরি গেল সব
জোয়ারের জলধারে,
মুক্ত দুয়ার—তবু দ্বারী মোরে
পশিতে দিলনা দ্বারে।
ভাবিলাম মনে, এহেন শাস্তি
বিধাতা লিখিল ভালে,
কারো অনিষ্ট কোনোদিন কভু
করিনি তো কোনো কালে।
জন্ম-নিঃস্ব—বিশ্বে অধিক
আপনার কিছু নাই,
হাতে তুলে কভু দিব কারে কিছু,
হেন ধন কোথা পাই?
অধিকার যাহে, কেহ যদি চাহে,
মনে হয়—দিতে পারি,
শুধু ফুল কটা—কী জানি বা কেন,
এহেন মমতা তারি।
দুর্বল হিয়া সদা আগলিয়া
পড়ে থাকে তারি কাছে,
চকিত নয়ন প্রহরী—কখন,
কেড়ে লয় কেহ পাছে!
ভেবে দেখি যবে, ক্ষুদ্রতা হেরি
আপনারি পায় লাজ,
শিবের অর্ঘ্য পরে পাবে ভেবে
শিরে পড়ে যেন বাজ।

অবনত-হিয়া অবশ-চরণ
ফিরিব যেমন পথে—
শরতের শশী সহসা যেন সে
নামিল আকাশ হতে!

ত্রয়োদশী বালা—হাতে হেম-থালা,
কুসুমের মালা তাহে,
চাহি মোর পানে স্নিগ্ধ নয়ানে
ফুলটিরে যেন চাহে।
চম্পক-কলি কর-অঙ্গুলি
রং সে চাঁপারই মতো ;
বাহুর গঠন চাঁপারই মতন,
চম্পকানন নত ;
ওষ্ঠ-অধর চম্পকদল,
চম্পা নয়ন-পাতা—
চম্পাবরণ পরেছে বসন,
তনুলতা চাঁপা-গাঁথা!
চাঁপারই মতন হাসিটি হাসিয়া
কহিল মধুর স্বরে—
ফুলটি তোমার দিবে কি আমারে
সঁপিতে মহেশ্বরে?

ক্ষুব্ধ হৃদয় নিমেষে জুড়াল,
মন্ত্রমুগ্ধ হিয়া—
ধন্য হইনু চম্পক-করে
পুষ্পটি তুলি দিয়া।
মনে হল—যেন গৌরী আপনি
ভক্তের কাছে মাগি
হাত বাড়াইয়া লইলা অর্ঘ্য
ব্যথা ভুলাবার লাগি।
পাষাণ ঠাকুর বেদনা বোঝে না!
পাছে লোকে করে ভুল—
পাষাণ প্রেয়সী ছল করি তাই,
রাখে বুঝি দুই কূল!
অথবা দেবতা আপনি ভুলাতে
সেবকের অভিমান,
করুণারূপিণী বালিকার হাতে
সাধি লয় সেবাদান।
তার বেশি আর কী আছে চাওয়ার!
কৃতার্থ আরাধন—
ফিরিলাম গৃহে ; অশ্রুবাষ্পে
ভরি লয়ে দু-নয়ন!

ভারতবর্ষ

গঙ্গাগোদাবরীসিন্ধুসরস্বতীতরলধারাবলিহারা,
বিন্ধ্যহিমাচলকাঞ্চিমুকুটধরা মলয়বলয়শোভাসারা,
নিযুতনিঝরঝরঝঙ্কৃতশিঞ্জিনী উপলনূপুরমণিপৃক্তা,
লক্ষতড়াগহ্রদ বক্ষের মৃগমদচন্দনপঙ্কানুলিপ্তা ;
জয় জয় ভারত মর-অমরাবতী জয় ভুবনেশ্বরি মাতা,
চিরসম্পদখনি দেশশিরোমণি! চরণে ধরণী নতমাথা।

বর্ষাশরত হিমশীতমধুআতপ সজ্জিত ফলফুলডালা,
শালতালীবটখর্জুরনারিকেলআম্রকাননকেশমালা ;
ধান্যগোধূমযব হরিতহিরণরুচি ঝলমল অঞ্চল দোলে,
চামেলিচম্পককুন্দকমলনীপ গ্রন্থিত বক্ষনিচোলে ;
জয় জয় ভারত মর-অমরাবতী জয় ভুবনেশ্বরি মাতা,
চিরসুষমাখনি রানীশিরোমণি! চরণে নিখিল নতমাথা।

বারণহয়মৃগসিংহমহিষবৃষশার্দূলবাহনসাথী,
হংসপারাবতশুকপিকচন্দনাময়ূরমুখরবনপাঁতি ;
তীর্থদেবালয়মন্দিরমন্ত্রিত শঙ্খঘণ্টারতিরাবা,
সপ্তস্বরাবেণুমুরজনিনাদিত ঝঙ্কৃতবীণরবাবা ;
জয় জয় ভারত মর-অমরাবতী জয় ভুবনেশ্বরি মাতা,
নিখিলশিল্পকলাগৌরবমণ্ডিতা! চরণে পৃথ্বী নতমাথা।

নিত্যলোকচিরবন্দিতপদযুগ নন্দিতবিশ্বনমস্যা,
দীপ্তজ্ঞানরবিরাগবিভাসিত আদিমযুগঅমাবস্যা ;
বিপুলবীর্য তব আর্যকীর্তি বল অর্পিল দুর্বল দীনে,
আশ্রমউচ্ছ্রিত সামমন্ত্র তব শান্তি সঁপিল সুখহীনে ;
জয় জয় ভারত মর-অমরাবতী জয় ভুবনেশ্বরি মাতা,
কর্মদাত্রী তুমি ধর্ম-ধাত্রী ভূমি! তব চরণে নতমাথা।

অম্বর'পরে চিরগম্ভীরমন্দ্রে বাজিছে কালের ডঙ্কা,
ধাবিত মানব যুগে যুগান্তরে অন্তরে সঙ্কটশঙ্কা ;
অভয়বাণী তব নাশি পন্থাভয় মাভৈঃ রবে দিল আশা,

আত্মা অমর বলি প্রথম প্রচারিল জাগ্রত তব দেশভাষা ;
জয় জয় ভারত মর-অমরাবতী জয় ভুবনেশ্বরি মাতা,
দুঃখবিপদজয়ী করুণা মূর্তিময়ী! তব চরণে নতমাথা।

নিখিললোক যেথা পুণ্যমিলন লভি ধন্য হইল তব বক্ষে,
নিখিল ধর্ম চির-লোকধর্ম ধরি শান্তি লভিল নবলক্ষ্যে ;
দিকে-দিকে উত্থিত দ্বন্দ্বকলহ যত ক্ষান্ত করিয়া মধুমন্ত্রে,
দীপ্তবাণী তব ঝঙ্কৃত করি দিলে বিশ্ববিপুলবীণযন্ত্রে ;
জয় জয় ভারত মর-অমরাবতী জয় ভুবনেশ্বরি মাতা,
শাশ্বতমানবমনমন্থন ধন! তব চরণে নতমাথা।

বিপন্না

কৌরবের সভাতলে বামহস্তে বসন সম্বরি
অন্য বাহু ঊর্ধ্বে তুলি শ্রীহরিরে ডাকি বারম্বার,
বিহ্বলা দ্রৌপদী যবে দুটি চক্ষু অশ্রুজলে ভরি
ঘৃণায় লজ্জায় ক্ষোভে মেগেছিল মৃত্যু আপনার ;—
শ্রীকৃষ্ণ তখনো সেই অপূর্ণ নির্ভর হেরি তার,
আপনারে একেবারে বস্ত্ররূপে দেয়নি বিতরি ;
কিন্তু যবে নিরুপায়, দুই বাহু মেলিয়া উদার,
চাহিল শরণ শেষে—নিমেষে আসিলা নামি হরি।
বিমূঢ় পাণ্ডবদল পরস্পরে চাহি রহে মুখে,
ধর্ষিতার হর্ষ হেরি দুঃশাসন গুমরায় দুখে!

বিপন্না দ্রৌপদী আজি ঘরে ঘরে মেলি দুই বাহু
কাঁদে যে তোমায় ডাকি ; কোথা তুমি লজ্জানিবারণ?
তুচ্ছ করি ভর্তৃদলে, ব্যর্থ করি দুঃশাসন রাহু—
এস তুমি আর্ত-সখা—এ দুর্দিনে, এস নারায়ণ।

সত্যদাস

পণ্ডিতের পদ লভি যেদিন বসিনু বেদগ্রামে,
সেইদিন প্রাতঃকালে ছাত্র এক সত্যদাস নামে

বিদ্যা অধ্যয়ন তরে মোর কাছে দাঁড়াইল আসি ;
—এতটুকু শিশু একা! চেয়ে দেখি—দূরে আছে দাসী!

সযত্নে বসায়ে পাশে. শিষ্ট বাক্যে ভুলাইয়া তারে,
শুনিনু অনেক কথা সুমিষ্ট আত্মীয় ব্যবহারে ;
পিতৃহীন, নিরুপায়, দরিদ্র সে—ওই তার ঘর ;
দাসী ভেবেছিনু যারে—মা তাহার, নহেকো অপর!

ত্বরিতে আসন ছাড়ি সসম্ভ্রমে নোয়াইয়া শির—
মনে-মনে পাদপদ্ম পরশিয়া মৌন জননীর,
কহিয়া আশ্বাসবাণী, বালকের লয়ে শিক্ষাভার.
নিশ্চিন্ত করিয়া তাঁরে ফিরাইনু স্বগৃহে তাঁহার।

পাঁচ বৎসরের শিশু—সরল সুন্দর সুকুমার—
এহেন শৈশবকালে কোন্ প্রাণে জননী তাহার
পাঠাইল পাঠশালে—যদিও তা আঁখির সম্মুখে ;
বুঝিনু কিসের আশে—কী গভীর দারিদ্র্যের দুখে!

মাথার বুলায়ে হাত, প্রাণে মনে আশীবাদ করি
বিবিধ কথায় গল্পে সকল সঙ্কোচ-শঙ্কা হরি—
বাড়িতে ক-জন থাক?—শুধাইনু শিশুরে যখন,
উত্তরিল মৃদুকণ্ঠে—বাড়িতে আমরা পাঁচজন।

'এই না বলিলে আগে—ভাই বোন আর কেহ নাই—
তুমি মার এক ছেলে! আরো তো সে তিনজন চাই!
তেমনি মধুর কণ্ঠে কহিল সে—মোরা—পাঁচজন—
মা ও আমি, ভোলা আর রাধারানী আর নারায়ণ।

'বাকি তিনজন কে কে?' শুধাইনু পরম বিস্ময়ে ;
গণনায় ভুল ভেবে বালক রহিল চেয়ে ভয়ে!
'রাধারানী কে আবার—অন্য কেহ বাড়িতে তো নাই?'
সে কহিল 'আছেই তো ; রাধারানী সে মোদের গাই।'

'ভোলা সে কাহার নাম?' হাসিয়া শুধানু তার কাছে ;
'জানেন না? ভারি দুষ্টু সে এক কুকুর-ভোলা আছে'
'নারায়ণ কে আবার?'—নাম শুনি প্রণমি চকিতে
কহিল—'ঠাকুর তিনি—যা বলেন, বাস তুলসীতে!

প্রণাম করেন নিত্য—দিনরাত ডাকেন যে তাঁরে—
পাঁচজন হলনাকো?—কত আর বলি বারে বারে!'
'এই পাঁচজন বুঝি?'—হাসিলাম পণ্ডিতের ভানে,
অন্তরে বুঝিনু ঠিক—সত্যবার্তা শিশুতেই জানে!

শ্রাবণী

কোথায় চলেছ তুমি নিরাভরণে—
ঘন নীল শাড়িখানি পরা পরনে!
    সমুখে দেখ না চেয়ে
    চলেছে গোপের মেয়ে
কত না ভূষণ বাজে করে চরণে,
তুমি চলিয়াছ শুধু নিরাভরণে।

কেহ বা শ্যামলী শ্যামা কেহ বা গোরী—
ছলকি-ঝলকি রূপ পড়িছে ঝরি,
    আঁধারে তনুটি ঢাকি
    চমকিছ থাকি-থাকি—
সবারে এড়ায়ে চল সুদূরে সরি,
মেঘেতে বিজলি-আভা রহে আবরি!

সকলেরি চোখে মুখে কত না হাসি,
তোমারি নয়ন কেন যেতেছে ভাসি?
    যার যাহা মনে আসে—
    কথা কয় হাসে ভাষে,
আসনে হিয়ার আশা উঠে উছাসি;—
তোমারি নয়ন কেন যেতেছে ভাসি?

গরজি শ্রাবণ-দেয়া ভ্রূকুটি হানে,
পবন মেতেছে সাথে কেন কে জানে!
    ঝর ঝর ঝরে জল—
    বন পথ পিচ্ছল,
চঞ্চল গোপীদল মানা না মানে;
আগুসরি চলে তবু সুদূর পানে!

কোথায় বেজেছে বাঁশি যমুনাকূলে—
কোথা কোন্ ফুলে-ভরা কদমমূলে;

তাই বুঝি দলে দলে
গৃহ ত্যজি সবে চলে ;
তুমিও কি চল সেথা বাঁশিতে ভুলে—
কালো জলে ভরা সেই যমুনা কূলে!

অদূরে তমালবনে ঘনালো কালো—
সবারে এড়ায়ে একা চলা কি ভালো?
ত্বরা চলি লহ সাথ,
নিবিড় শ্রাবণ রাত—
কী করি চিনিবে একা পথ ঘোরালো ;
কালো কি তোমার চোখে দেখালো আলো!

ওগো সাহসিকা, কথা কহ একবার—
বারেক জানাও শুধু বেদনা তোমার।
জানি সে পাগল ডাকে
কেবা কোথা ঘরে থাকে!
লাজ মান ভয় সব হয় পরিহার ;
চোখে তবে জল কেন, কী ব্যথা তোমার?

তুমি কি রাজার মেয়ে—তুমি রাধিকা!
কানুর প্রণয়ে কেনা চিরারাধিকা!
রতন ভূষণ সাজে
তোমার কি যাওয়া সাজে,
তুমি যে কালোর দাসী সেবাসাধিকা,—
তাই আভরণহীনা তুমি রাধিকা!

গোপীর আননে হাসি হেরিয়া হরি
হরষে বসায় পাশে আদরে ধরি ;
সোহাগ জানায়ে শেষে
বিদায় করিবে হেসে,
তোমার চোখের বারি মুছাতে, মরি!
কাঁদিয়া সাধিবে সে যে রজনী ভরি।

নীলবাসে ঢাকা তনু যাহার তরে,
সে নীল হেরিবে তাহা নয়ন ভরে।
অতুল সে প্রেমখানি
সফল হইবে, জানি—
নীলমণি বুকে সারা যামিনী ধরে ;
হরষে ব্যথায় তারো নয়ন ঝরে!

প্রণয় যে হাসি নয়, শুধু আঁখিজল,
পলকে হারায় সে যে—পলকে বিকল ;
    তোমার প্রাণের হরি
    জানে যে তা ভালো করি ;
চেনে সে প্রাণের সেবা, তাই সে পাগল—
তোমারি প্রেমের লাগি খোঁজে নানা ছল।

কর্ম

শক্তিমায়ের ভৃত্য মোরা—নিত্য খাটি নিত্য খাই,
শক্ত বাহু শক্ত চরণ, চিত্তে সাহস সর্বদাই ;
ক্ষুদ্র হউক তুচ্ছ হউক, সর্বশরমশঙ্কাহীন—
কর্ম মোদের ধর্ম বলি কর্ম করি রাত্রি দিন।

চৌদ্দ পুরুষ নিঃস্ব মোদের—বিন্দু তাহে লজ্জা নাই,
কর্ম মোদের রক্ষা করে, অর্ঘ্য সঁপি কর্মে তাই ;
সাধ্য যেমন শক্তি যেমন—তেম্‌নি অটল চেষ্টাতে
দুঃখে-সুখে হাস্যমুখে কর্ম করি নিষ্ঠাতে।

কর্মে ক্ষুধায় অন্ন জোগায়, কর্মে দেহে স্বাস্থ্য পাই,
দুর্ভাবনায় শান্তি আনে—নির্ভাবনায় নিদ্রা যাই ;
তুচ্ছ পরচর্চাগ্লানি—মন্দ ভালো কোন্‌টা কে—
নিন্দা হতে মুক্তি দিয়ে হালকা রাখে মনটাকে।

পৃথ্বিমাতার পুত্র মোরা, মৃত্তিকা তাঁর শয্যা তাই,
শষ্পে তৃণে বাসটি ছাওয়া, দীপ্তি হাওয়া ভগ্নী ভাই ;
তৃপ্ত তাঁরি শস্যে-জলে ক্ষুৎপিপাসা দুঃসহ,
মুক্ত মাঠে যুক্ত করে বন্দি তাঁরেই প্রত্যহ।

পক্ষীপ্রাণী, নিত্য জানি, শ্রম বিনা কার খাদ্য হয়,
সুদ্ধ মানুষ ভিন্ন—সে কি বিশ্ববিধির বাধ্য নয়!
চেষ্টা ছাড়া অন্ন যে খায়—অন্যে তারে বল্‌বে কী,
ভিক্ষুকেরও ঘৃণ্য তারে গণ্য করা চল্‌বে কি?

ক্ষুদ্র নহি তুচ্ছ নহি—ব্যর্থ মোরা নই কভু—
অর্থ মোদের দাস্য করে, অর্থ মোদের নয় প্রভু ;

স্বর্ণ বল রৌপ্য বল বিত্তে করি জন্মদান,
চিত্ত তবু রিক্ত মোদের নিত্য রহে শক্তিমান।

কীর্তি মোদের মৃত্তিকাতে প্রত্যহ রয় মুদ্রিত,
শূন্য 'পরে নিত্য হের স্তোত্র মোদের উদ্‌গীত ;
সিন্ধুবারি পণ্য বহি ধন্য করে তৃপ্তিতে,
বহ্নি মোদের রুদ্র প্রতাপ ব্যক্ত করে দীপ্তিতে।

বিশ্ব জুড়ি সৃষ্টি মোদের, হস্ত মোদের বিশ্বময়,
কাণ্ড মোদের সর্ব ঘটে কোন্‌খানে তা দৃশ্য নয়?
বিশ্বনাথের যজ্ঞশালে কর্মযোগের অন্ত নাই,
কর্ম, সে যে ধর্ম মোদের—কর্ম চাহি—কর্ম চাই।

ঠাট্টা করুক ব্যঙ্গ করুক লক্ষ্মী-পেঁচার বাচ্ছারা—
পারবেনাকো কর্‌তে মোদের কর্মদেবীর কাছ-ছাড়া
শান্তিভরা দৃষ্টি যে তাঁর জ্বল্‌ছে মোদের অন্তরে,
শঙ্কা-শরম ডঙ্কা মেরে তুচ্ছ করি মন্তরে।

মাতৃভূমি! পিতৃপুরুষ! কর্মে যেন দীক্ষা হয় ;
রুদ্রস্বরে গর্জি বল—ভিক্ষা নহে, ভিক্ষা নয়!
হস্ত যখন অঙ্গে আছে, সঙ্গে আছেন শক্তিময়,
কর্ম-ছাড়া অন্য কারে করব মোরা ভক্তি-ভয়?

বিচিত্রা

তোমারে নূতন করে হেরিব নয়ন ভরে
তাই চির-পুরানো এ আঁখি
আলসে বিলাসে কাজে নিতি নব-নব সাজে
সাজাইতে চাহে থাকি-থাকি!
তুমি তাহে মর লাজে, কভু বুকে ব্যথা বাজে,
বুঝিতে পার না তা যে, প্রিয়ে,
তাই মিছে কর রোষ পায়ে-পায়ে ধর দোষ,
শত প্রশ্ন সেই কথা নিয়ে!
শরতে সোনালি আলো চোখে মোর লাগে ভালো,
শেফালির বৃন্তরাঙা বাসে

ঘেরিয়া ও অঙ্গখানি কী আনন্দ মনে মানি—
কহিতে পারি না তাহা ভাষে ;
বসন্তের লঘুবায় হৃদয়ের কিনারায়
যে হিল্লোল হানে আচম্বিতে,
রূপের মাঝারে তারে চক্ষু ভরি হেরিবারে
তোমারে চাহে সে মূর্তি দিতে ;
আষাঢ়ের মন্দ্রমাঝে যে ব্যথা গুমরি বাজে
সজল করুণ মূর্ছনায়,
তারি শ্যাম বর্ণ ছানি মেঘলা বসনখানি
জড়াইতে অঙ্গে তব চায়!
এলো করি কালো চুল দুলাইয়া কর্ণদুল
সাজাইয়া ফুল-আভরণে,
শতবার শতরূপে চেয়ে দেখি চুপে-চুপে,
চোখে জল আসে অকারণে।

এততেও তৃপ্তি নাই আরো চাই আরো চাই—
ভাবের বিচিত্র দিক দিয়া,
সুখে দুখে লাজে ভয়ে অনুনয়ে অবিনয়ে
তোমারে হেরিতে চাই প্রিয়া ;
তাই কভু সমাদরে টেনে লই অঙ্ক 'পরে
চেয়ে দেখি মুদিত ও মুখ,
কভু বা কপট রোষে কাঁদাইয়া অসন্তোষে
ব্যথা দিয়া লভি নব সুখ ;
সুগোপন আলাপনে ডেকে আনি সখীজনে,
শরমে মরিয়া যাও যবে,
লাজে রাঙা সে বয়ান ছল ছল অভিমান
সে সুখের তুলনা কে করে!
গুণ্ঠন খসায়ে টানি কুটিল কটাক্ষখানি
টেনে আনি চোখের সন্ধানে,—
সে আঘাতে মরে বাঁচি, সে মৃত্যুর কাছাকাছি
কোন্ তৃপ্তি মন নাহি জানে!
হেরি এ অশান্ত হিয়া তুমি মনে ভাব প্রিয়া—
নিতান্ত চপল এ যে, হায়!
সত্যই আমি যে তাই, চাঞ্চল্যের অন্ত নাই,
অপরাধ লইনু মাথায়।
নূতনের প্রলোভন ভুলায় এ মুগ্ধ মন,
আজীবন করিয়া স্বীকার,

তবু জানি মনে-মনে খ্যাতিহীন এ জীবনে
তুমি মোর প্রাণের সেতার!
বসন্তে বাহারে দেশে মল্লারে যোগিয়া বেশে
বিভাসে পরজে সোহিনীতে,
তুমি মোর বক্ষ 'পরে বাজিয়ো বিচিত্র স্বরে
নব-নব অপূর্ব সংগীতে।

দেয়ালি

বন্ধু, তুমি আচ্ছা মানুষ—
এমন খেয়ালি!
তোমার, দেখি, সকল কাজই
পরম হেঁয়ালি ;
আজকে রাতে ঘরে-ঘরে
জ্বলছে বাতি থরে-থরে ;
দীঘির জলে গাছের 'পরে
আলোর দেয়ালি।
তোমার ঘরই আঁধার শুধু—
কেমন খেয়ালি!

পথের ধারে কাতার-বাঁধা
সৌধশিখরে,
হাজারতর মালায়-গাঁথা
আলোক ঠিকরে ;
গরিব যারা কুটিরবাসী,
তাদের ঘরেও আলোর হাসি,
তুমি এমন উদাস হয়ে
রইলে কী করে?
চারিধারে দীপের হারে
দীপ্তি ঠিকরে!

আস্‌তে পথে এম্‌নি চমক
লাগ্‌ল আঁখিতে,
তোমার গৃহ শুধাই সবে
নয়ন থাকিতে!

কেউ বা শুনে অবাক মানে,
কেউ বা চাহে মুখের পানে,
কেউ বা কুটিল দৃষ্টিটি তার
চায় না ঢাকিতে!
এম্‌নি পথে আলোর ধাঁধা
লাগ্‌ল আঁখিতে!

অনেক খুঁজে এলাম যদি,
সে এক ভাবনা—
অন্ধকারের আড়াল ভেদি
যাই কি—, যাব না!
এমন সময় আঁধার ঠেলে
যেমন করে কাছে এলে,—
তেমন করে আসা যে আর
কোথাও পাব না!
এক নিমেষে ভুলিয়ে দিলে
সকল ভাবনা!

ভেবেছিলে হয়তো মনে—
বাহির দুয়ারে,
অমারাতের আগল এঁটে
ছল্‌ব উহারে।
বাহির দেখে ভয় কি মানি,
মন যে তোমার মনে জানি ;
প্রীতির আলো জ্বলছে যেথায়
জ্যোৎস্না-জুয়ারে ;
অন্ধকারের পরদা ঘিরে
ছল্‌বে উহারে?

ওগো আমার দুঃখরাতের
আঁধার সরণী!
ভিড়াও তোমার আপন ঘাটে
প্রাণের তরণী।
কিসের ক্ষতি অন্ধকারে,
মন যদি মন চিনতে পারে—
এক নিমেষে উঠবে হেসে
আমার ধরণী ;
ওগো প্রাণের দীপান্বিতা—
হৃদয় হরণি!

ফুলের দণ্ড

শেষ পাপড়িটি ঝরিয়া পড়েছে ভূমিতলে—
শেষ রেণুকণা বাতাস নিয়াছে লুটি ;
কালকে যা ছিল ফুল হয়ে দলে-পরিমলে,
আজ তার শুধু বোঁটার মাঝারে ছুটি!

প্রজাপতি আর ভুলেও সেথায় নাহি বসে,
অলিগুঞ্জন কানে আর নাহি বাজে ;
উতলা সমীর গন্ধ আশায় নাহি পশে—
ফুলের দণ্ড দণ্ডরূপেই রাজে!

কোথায় সুরভি কোথায় সুষমা কোথা মধু—
হত-গৌরব গত-শোভা সে যে আজ ;
শুষ্ক রুক্ষ জীবনে আর কি মিলে বঁধু?
ফুলেরে ফুটায়ে ফুরায়েছে তার কাজ!

প্রেম গেছে যার ; জীবন আর কি তারে সাজে—
রিক্ত কুসুম-বৃন্তের কোথা ঠাঁই?
রূপরসহীন কণ্টক শুধু প্রাণে বাজে—
যার সব গেছে,—তারো বেঁচে থাকা চাই!

নিঝুম-রানী

আমি রাতভিখিরি নিত্যি ফিরি নিঝুম-রানীর দরবারে—
পাগল মনের খোস্ খেয়ালের দরকারে ;
হাত বাড়িয়ে নাইকো কোনো ধন চাওয়া,
মুখ ভারিয়ে নাইকো কারো মন পাওয়া—
দাবি-দাওয়া নাই কিছু সে সরকারে!

থাকে থাকুক চাঁদ আকাশে, তারার আলো—নয়তো নয়,
সন্ধ্যা থেকেই অন্ধ আকাশ হয়তো হয় ;
রাত্রি-দেবীর ছত্রতলের কোণটিতে,
জোনাই জ্বলে শুধু পাশের বনটিতে ;
হই না একা—নাইকো কোনো ভাবনা ভয়।

আমি চলি আপন মনে রানীর গোপন সন্ধানে,
সন্ধ্যা হলেই সে যে আমার মন টানে ;
তার সে ডাকের নাইকো ভাষা কিচ্ছুরে,
আঁধার সাথে বসে সে যে চিৎ জুড়ে ;
খুঁজে বেড়াই কোন্‌খানে রে কোন্‌খানে?

দিবালোকের বেড়ার শেষে, কোলাহলের আড়্পারে-
ঠেলাঠেলির রঙমহলের বা'র-দ্বারে—
শূন্যে ছাওয়া অনন্ত তার মন্দিরে
ঘুরে বেড়াই গোলক ধাঁধায় বন্দীরে—
কোথায় রানী—হাতড়ে বেড়াই চারধারে—

ফুলের গন্ধ ইঙ্গিতে সে হঠাৎ বলে—এইখানে!
কোন্‌খানে তা মনে-মনে সেই জানে ;
তারার আলো মাথার উপর কয় হেসে—
ওখানে নয়, এই খানেতে রয় সে যে—
হাওয়া বলে—কারু কথার নেই মানে!

দাতার দেখা নাইকো তবু দানে যে তার মন ভরে,
নিত্যি রাতে পাই সাড়া তার অন্তরে ;
মানুষটাকে আড়াল করে সর্বদা
তৃপ্তি বিলায় কে যেন রে সর্বথা—
শান্তি দিয়া নীরবতার মন্তরে।

নিঝুম-রানী চুপটি করে হাসে মোহন ভঙ্গিতে,
নিশীথরাতের নীরব নিথর সংগীতে ;
যে সংগীতে ফুল ফুটে আর চাঁদ উঠে,
যে সংগীতে মলয় হাওয়ার বাঁধ-টুটে—
সীমা চাহে সীমার বাঁধন লঙ্ঘিতে!

দেয়ালা

জননীর কোলে শুয়ে শিশু করে স্বপন-দেয়ালা
শূন্য 'পরে চেয়ে কার পানে ;
কী ক'রে ভরিয়া ওঠে কোথা তার রসের পেয়ালা,
কে পিয়ায়—তাই বা কে জানে!

কভু হাসে কভু কাঁদে কভু ভয়ে আকুঞ্চিত ভুরু—
অভিমানে ঠোঁট দুটি ফুলে ;
ওইটুকু কচি বুক কোন্ ভয়ে করে দুরুদুরু ,
কী বেদনা ওই মর্ম্মমূলে!

সদ্যবিকশিত পুষ্প—তারো আছে সুখদুখভয়
তারো মাঝে ফুটে অভিমান,
রহস্য খুঁজিতে গিয়ে বাড়ে শুধু অপার বিস্ময়—
কে বুঝিবে তাহার সন্ধান!

মোরাও শিশুরই মতো হাসি কাঁদি করি মুখভার
যতক্ষণ নাহি কাটে বেলা,
কোথা কোন্ অলক্ষিতে সেই জানে অ্ শুধু তার—
যে জন খেলায় এই খেলা!

ঝরনাঝারা

ঝরঝর ঝরনা গিরিঘরকরনা—
জ্বল জ্বল উজ্জ্বল যেন কালো কজ্জল,
কভু সাদা ধব্ বব্ তুষারের উদ্ভব,
উঁচু হতে নিচুতে না টলিয়া কিছুতে,
তুহিনের নির্ঝর দিন রাত ঝর্ঝর

ঝর্ ঝর্ ঝর্‌ছে ধারা নাহি ধরছে!
হরদম্ হরদম্ ধুলা বালি কর্দম
লতাপাতা কুট্‌কাট্ চলে করে লুট্‌পাট্,
ফুরসত নাই তার, বিদ্যুৎ ভাই তার,
হিম জল-অঞ্চল অবিরল চঞ্চল
কিঙ্কিণি কঙ্কণ রামধনু রং কোন্!
বালা আর চুড়িতে বাজে শিলা নুড়িতে,
খেলিতেছে ঝম্পাই আস্‌মানে কম্পাই!
শিখরীর উচ্চে চমরীর পুচ্ছে,
আষাঢ়ের ঘটাতে সিংহের জটাতে
নামে মহা ঝম্পে হরিণের লম্ফে,
ধর্ ধর্ ধর্ ধর্ কই ঘর, সর্ সর্—
আর নাই, আর নাই ঘর বা'র তার নাই,
আঁকা-বাঁকা ভঙ্গি শেয়ালের সঙ্গী,
ফিরে ফিরে চম্‌কায় মাঝে মাঝে ধম্‌কায়,
গাছে-গাছে দোল খায় শিলাতলে টোল খায়,
পাকে-পাকে লুট্‌ছে তবু ফিরে ছুট্‌ছে!
সাপ সাপ, ওই সাপ— সর্ সর্ বাপ বাপ।
সাপ নয়, সাপ নয়, বরফেরও ধাপ নয় ;
ও যে সেই ঝরনা গিরিঘরকরনা—
ও যে মোর ঝরনা আপ্‌নার পর না!
চিক্‌মিক্ ঝিক্‌মিক্ রবি করে ধিক্ দিক্,
ঝিক্‌মিক চিক্‌মিক্ কিছু ওর নাই ঠিক,
ঝম্ ঝম্ ঝম্ ঝম্ এ যে দেখি কম্ কম্,
কই কই, কোথা গেলা, ইঁচা বাচা চাঁদা চেলা—
ওই গেল সরিয়া গিরিমাঝে মরিয়া!
ওই ফের আলোতে সাদাতে ও কালোতে
ফুঁসিয়া ও ফাঁপিয়া কাঁপাইয়া কাঁপিয়া,
ফেনাময় মস্‌গুল বেল যুঁই কাশফুল
কী ভীষণ তর্জন মাঝে মাঝে গর্জন,
ফ্যাস্ ফ্যাস্ ভক্ ভক্ শাঁকচুন হাঁস বক,
ফিস্ ফিস্ ফস্ ফস্ বেটি কারো নয় বশ :
দুর্মদ গতিতে পতিতের মতিতে,
খেয়ালে আনন্দে পাগলামি ছন্দে,
তড়বড়্ দড়বড়্ পার বুঝি হয় গড়,
উৎরায় উৎরাই কোথা কোনো খুঁত নাই,

হরদম্ হরদম্ ছুটে চলে দুর্দম,
কম কম, থম্ থম্ ওই বুঝি লয় দম—
এইবার পাহাড়ে ঠেকে বুঝি ডাহারে!
তারপর তারপর— বা'র কর্ বা'র কর্
চলিবার ফন্দি ক্ষণিকের সন্ধি—
পাশ কেটে এইবার হয় দেখি দুই ধার ;
কই কই, সর্ সর্ দুধ দই ক্ষীর সর—
গদ্ গদ্ গদ্ গদ্ চলে ফের তদ্বৎ,
বুদ্ বুদ্ বুদ্ বুদ্ কেটে চলে বুদ্বুদ,
কল কল তল্ তল্ আঁখি দেখি ছল্ ছল্
চোখে বুঝি আসে জল— বল্ বল্ ঠিক বল্ ;
থাম্ থাম্ আর না থামা তোর কান্না—
ওই দেখ্ গঙ্গা তরলতরঙ্গা ;
বিলিয়ে দে আপনায় থাক্‌বে না ভাবনাই।

অ-ধরা

তুমি ধরা কোনোদিন দিবেনাকো, সে তো জানি,
তবু ধরিতে তোমারে ধরে রাখি এ জীবন ;
তাই বাতাসে বাড়ায়ে বাসনার বাহুখানি
আমি মেলে বসে থাকি মরমের দু-নয়ন।
ওগো চির-চাওয়া ওগো অ-পাওয়া আমার প্রিয়া—
জানি তোমার আমার মিলন বন্ধু, মরণের পথ দিয়া।

ওই সন্ধ্যার হাতে হাতটি লুকাবে বলে
হের প্রভাতের সাধ ফুটিছে দিনের দাহে,
তার মুগ্ধ আঁখিটি মুদিতে আঁধার কোলে
সে যে পলে পলে পলে মরিয়া বাঁচিতে চাহে ;
জাগে সন্ধ্যার আঁখি রাত্রির বাতায়নে—
যবে সকালের চাওয়া মিলায় আঁধার মৃত্যুর আবরণে!

ওরে তবু চাই তোরে তবু তোরে চাই প্রিয়া—
জানি পাব একদিন চির-চাওয়া আর না-পাওয়ারই পথ দিয়া!

পাহাড়িয়া বাঁশি

পাহাড়িয়া বাঁশুরি বাজায় ;—
পাষাণের বুক চিরে
ধ্বনি কি জন্মিল ফিরে
ব্যথায় বাতাসে চিড় খায়!
শৈলে শৈলে ধ্বনি লাগে,
রন্ধ্রে রন্ধ্রে ফণী জাগে,
বনে বনে প্রমত্ত ময়ূর
গগনে লাগায় মেঘ
পবনে জাগায় বেগ,
নেত্রে উঠে নির্ঝর নূপুর!
বিরহ-ব্যাকুল বেদনায়
পাহাড়িয়া বাঁশুরি বাজায়!

বনের বর্বর হিয়াহীন ;
কঠিন কঠোর কায়,
নাহি যার দুঃখদায়—
শিশুপ্রায় সরল স্বাধীন!
তারে কে শেখালে সুর
সুধা হতে সুমধুর—
সুবিধুর বিরহের ব্যথা!
মুরলীর রন্ধ্র ভরি
বাহিরায় মূর্তি ধরি
পাষাণে সঞ্চারি সজীবতা!
ফুকারিয়া জীবনপ্রিয়ায়
পাহাড়িয়া বাঁশুরি বাজায়।

গিরিপারে খাসিয়া-বস্তিতে,
তারি সে পরান প্রিয়া
করুণ তরুণী হিয়া
ধুলায় লুটায় সে ধ্বনিতে!
ঘরে ঘরে বন্ধ দ্বার
চারিধারে অন্ধকার
দীর্ঘ পথ, সুদূর বাঁশরি—
তাই সে সুরের স্পর্শে
চোখে শুধু ধারা বর্ষে

পরবাসী প্রিয় মুখ স্মরি—
তবু সে নিঠুর শুধু, হায়।
জেনে-শুনে বাঁশুরি বাজায়।

দুই পারে দুইটি হৃদয়,
সুরের বিদ্যুৎ-রথে
অজানা উজান পথে
এমনি করিয়া পরিচয়!
দেহ দূরে পড়ে আছে—
মনে মনে তবু কাছে,
মাঝে বহে বিরহের নদী ;
অপার সে পারাবার
দুয়ে করে পারাপার
সুরের সেতুতে নিরবধি!
পরে শুধু চমকিয়া চায়,
পাহাড়িয়া বাঁশুরি বাজায়!

গঙ্গাস্নান

তাই বলি—গঙ্গাস্নানে কেন এত ঝোঁক!
ওইটুকু ছোট্ট মেয়ে—ন-বছরই হোক্,
নিতান্ত বালিকা ছাড়া কী বলিব আর—
এ বয়সে অন্য কিছু সম্ভবে না আর!

প্রত্যহ প্রত্যূষে দেখি, শয্যাখানি ছাড়ি
অস্থির হইয়া উঠে যেতে তাড়াতাড়ি
নদীর কিনারটিতে ; শুনিবে না কানে—
বাড়িতে নাওয়ার কথা—কেন সেই জানে!

বুঝিতে পারি না আর, সেদিন গোপনে
লুকায়ে ব্যাপার তার হেরিনু নয়নে।
ছয়মাস আগে তারি ছোট বোন্‌টিরে
যেখানে করেছি দাহ জাহ্নবীর তীরে,
ঠিক তারি পাশটিতে চুপ করে চেয়ে
হেরিলাম এক দৃষ্টে বসে আছে মেয়ে!

মৌন কণ্ঠে নাহি বাণী, চক্ষে নাহি জল,
বিস্মিত ব্যথিত দৃষ্টি বুঝি সে কেবল
খুঁজিয়া দেখিতে চায়, কী করিয়া ধূলি
কোথায় রাখিল তারে লুকাইয়া তুলি!

ভস্মপাশে ফুলমালা—মূর্তিমতী শোক,
বুঝিলাম গঙ্গাস্নানে তাই এত ঝোঁক।
বহুদিন পরে চোখে ফিরে এল জল,
জাহ্নবীর ভরা আঁখি করে ছলছল!

ভুঁইচাঁপা

ভুঁইচাঁপা, তুই ভুঁয়েই ফুটে লুটিয়ে থাকিস্ ভুঁয়ে—
তোরে হেরে চিত্ত আমার পড়ছে নুয়ে নুয়ে।
নীল আকাশের আলোর পরশ
নীলচোখে তোর বুলাক্ হরষ
মাটির কোলের মায়া তবু থাকুক তোরে ছুঁয়ে।

স্বর্ণচাঁপা বাড়াক বাহু ঊর্ধ্ব আকাশ পানে,
ধরার ধরা এড়িয়ে চলুক মন যদি তাই মানে।
করুণ চোখে অরুণ সাথে
দৃষ্টি মিলাক্ দিনে রাতে,
গভীর রাতে জানাক্ প্রীতি চাঁদের কানে কানে।

তুই হেথা থাক্ তৃপ্ত হয়ে মৃত্তিকা মার বুকে,
মায়ের মধু রসের ধারা লেগেই থাকুক্ মুখে ;
তারি মতন সবার পিছে
থাকুক্ রে তোর আসনখানি সর্বসহার সুখে।

দোল

কে তোদের দোল দিল, তাই বল্—
ও তাল-খেজুর ও বেণুবন, নারিকেলের দল,
কে তোদের দোল দিল তাই বল্
শাখায় শাখায় পাতায় পাতায়
অমন্ করে কে আজ মাতায়,
অচঞ্চলে কর্‌লে কে আজ উচ্ছল চঞ্চল।

ওপার হতে আষাঢ় এল চিকন কালো বেশে—
ইশারাতে সেই কি তোদের ডাক দিয়েছে হেসে?
তারি হাওয়ার হাতছানিতে
জাগ্‌ল কি আজ আচম্বিতে
মর্মরিত শাখায় তোদের হরষ-কোলাহল।

আমার মনেও তোদের মতন অম্‌নি আকুলতা—
বুকের 'পরে আছ্‌ড়ে মরে হিয়ার যত ব্যথা।
তোদের পাগল শাখার ঘেরে
আজকে আমায় জড়িয়ে নেরে—
অম্‌নি করে দুলুক রে মোর পরানবিহ্বল।

সন্ধ্যায়

(গজল গান)

রজনীগন্ধা বাস বিলালো—
সজনি, সন্ধ্যা—আস্‌বি না লো?
বিদায়-মায়া বিছায় ছায়া,
ধরণীকায়া করুণ কালো।

ত্বরিতে ফিরে বন-বিহঙ্গ
বরিতে নীড়ে প্রণয়ী সঙ্গ ;
তরণী তীরে ভিড়িছে ধীরে
তিমির নীরে কাঁপিছে আলো।

নিভৃত রাতি কী করি যাপে—
নিশীথ-বাতি শিহরি কাঁপে ;

বিরহিণীরা —চির-অথিরা
ভাবে অধীরা—মরণ ভালো!

কোকিল ডাকে, আয় বসন্ত,
সখি লো, হাঁকে বায় দুরন্ত ;
আজি এ রাতে পরান মাতে
বাহুর সাথে বাহু মিলালো।

বঁধুর চিত্তে দোলা রে ছন্দ,
মধুর নৃত্যে ভোলা রে বন্ধ ;
টুটায়ে দ্বন্দ্বে ছুটায়ে গন্ধে
মিলনানন্দে অমিয়া ঢালো।

ব্যথার পূজা

বেদনার শুক্তিমাঝে আনন্দের মুক্তাফল ফলে,
যে শুক্তির জন্মশয্যা অন্তরের অন্তরশ্রুজলে।
ব্যথা মোর থাক্ বক্ষে প্রিয়পদে সঁপি মুক্তাফল,
যে প্রিয় আমার সেই গোবিন্দের চরণকমল।

বিদায়ে

জীবন-ঘাটের সোপান-সীমা প্রায় তো হলাম পার,
যে কটা ধাপ রয়েছে আর বাকি,—
ভাঙন-ধরা শ্যাওলা-পিছল তাও যে চারিধার—
পার হতে আর পারব সে-কটা কি?
দিনের আলো নিবিয়ে আসে ক্লান্ত আঁখির 'পরে,
আসছে কানে কালোজলের ডাক ;
তবু আমায় ফিরতে বলিস্ তোদের খেলাঘরে,
ওরে পাগল, হাতছানি তোর রাখ্!

প্রথম যেদিন তরুণ প্রাণের যাত্রা হল শুরু,
সঙ্গে সেদিন কেউ ছিল না আর
নূতন চলার আবেগভরে বক্ষ দুরু-দুরু
চক্ষে তরল দৃষ্টি সুষমার ;

কানের কাছে কোকিল ডাকে আকুল কলতানে,
ব্যাকুলতায় এগিয়ে চলে পা ;
দখিন বায়ু বুনো-ফুলের গন্ধ বয়ে আনে,
কিছুই যেন নিষেধ মানে না!

পথের মাঝে জুট্‌ল সাথী, কেউ-বা খানিক চলে
সঙ্গ ছেড়ে এগিয়ে গেল আগে,
কেউ-বা কোথাও পড়ল বসে কিছুই নাহি বলে,
জানি না কোন্ গোপন অনুরাগে।
কেউ-বা চলে. কেউ-বা আসে, কেউ-বা ফেলে যায়,
সঙ্গী বলে কারেও নাহি পাই ;
আপন বেগে চল্‌ছে চরণ চলার আকাঙ্ক্ষায়,
ফিরে দেখি—সময় তারো নাই।

প্রথম কুড়ির চাতাল 'পরে লাগল নূতন নেশা,
পথের চেয়ে পথের সাথী 'পরে,
ফুলের গন্ধ যেন-বা কার কেশের গন্ধে মেশা—
জড়িয়ে ধরে গভীর আবেশ ভরে!
চল্‌তে গিয়ে বসে পড়ি, বস্‌তে গিয়ে চলি,
ভুল হয়ে যায় চলায় না-চলায়,
কানের কাছে বউ-কথা-কও প্রথম কথা বলি
বলাতে চায় কোন্ সে অ-বলায়!

এমনিতর নেশার ঝোঁকে কাট্‌ল কত দিন,
হাতের সাথে হাতটি দিয়ে বাঁধা,
দুই কুড়ি ধাপ পেরিয়ে এলাম, দৃষ্টি ক্রমে ক্ষীণ,
পায়ে-পায়ে পাই যে শেষে বাধা!
পাখির কণ্ঠ মিলিয়ে আসে ঝোড়ো হাওয়ার হাঁকে,
ফুলের গন্ধ মিলায় সে যে ধীরে ;
সঙ্গীজনের টুট্‌ল নেশা কালো জলের ডাকে,
চোখের দৃষ্টি মিলায় নদীনীরে!

সম্মুখের ওই চাতাল ভরি নানা লোকের ভিড়,
মন্দিরেতে উঠ্‌ছে কলরব ;
চলার গতি সবার যেন আস্‌ছে হয়ে থির,
আসন নিতে ব্যস্ত দেখি সব
ঠেলাঠেলির কলধ্বনি উঠ্‌ছে চারিভিতে,
তারি মাঝে নদীর গরজন ;

নিরুৎসাহ মূর্তিগুলি জাগায় শুধু চিতে
অর্ধমৃতের চিত্র সুভীষণ।

ওই যেখানে ঢেউয়ের শেষে নদীর পরপারে—
ঝাপসা আঁখির দৃষ্টি-অন্তরালে,
অজানা ওই আঁধার ঘেরা অচিন বেড়ার ধারে
সন্ধ্যাবধূ তারার বাতি জ্বালে,—
ওইখানে ওই সুদূর পারের নূতন পথের শেষে
মোর তরে কি বাজছে সাঁঝের শাঁখ!
এবার—সে তো দেখাই গেল—যাব যে ওই পারে—
যেখানে ওই নীল মোহানার বাঁক!

লাগ্‌ছে গায়ে শীতের হাওয়া, জাগছে শিহরণ,
ভাব্‌ছি আজ এ জীবন সীমানাতে—
নূতন সাথীর নূতন রূপটি কী মনোহরণ,
কী পরিচয় হবে বা তার সাথে!
যে কটা ধাপ রইল বাকি, হোক্‌ বা না হোক্‌ সারা,
পার পাব তো—যতই বাধা থাক্‌,
তোরা আমায় করিস্‌ ক্ষমা, ভালোবাসিস্‌ যারা,
পেছন থেকে দিস্‌নে আজ আর ডাক।

তপস্বিনী ভারত

সেদিন ধ্যানের নেত্রে চাহি এই ভারতের পানে,
মনে হল, এর চেয়ে পুণ্য মূর্তি ধরণী না জানে!
বহু কষ্ট বহু চিন্তা, বহু ধৈর্য বহু ধারণায়
বিধাতা করিলা সৃষ্টি তপস্বিনী ভারত মাতায়।
শুষ্ক রুক্ষ জটাজাল মেঘসম ঊর্ধ্ব নীলাকাশে,
যোগমগ্ন শিবনেত্র উত্তমাঙ্গ সমুচ্চ কৈলাসে ;
গিরিগাত্র গৈরিকের কর্কশ কৌষিকবাস-পরা ;
মৃগমদবন্দনাক্ত রুদ্রাক্ষ ও পদ্মবীজ ধরা
বনানি বিপুল হস্তে ; অতীতের ঐশ্বর্য বিভূতি
অবলেপ সর্ব অঙ্গে, ভস্মশেষ বাসনা আহুতি ;
জাহ্নবীশীতল বক্ষে অগণিত তীর্থহার পরি
দাঁড়াইয়া মৌনবাচা মূর্তিমতী সাধনা-সুন্দরী ;

তপোবন-নামাবলী বরঅঙ্গে শোভে সুবিশাল,
সমুদ্র ধোয়ায় যাঁর পাদপদ্ম কোটিকল্পকাল।

যৌবন চাঞ্চল্য

ভুটিয়া যুবতী চলে পথ ;
আকাশ কালিমামাখা কুয়াশায় দিক্ ঢাকা
চারিধারে কেবলি পর্বত ;
যুবতী একেলা চলে পথ।
এদিক ওদিক চায় গুনগুনি গান গায়,
কভু বা চমকি চায় ফিরে ;
গতিতে ঝরে আনন্দ উথলে নৃত্যের ছন্দ
আঁকা-বাঁকা গিরি-পথ ঘিরে।
সহজ সচ্ছন্দ মনোরথ—
ভুটিয়া যুবতী চলে পথ।

টস্‌টসে রসে ভরপুর—
আপেলের মতো মুখ আপেলের মতো বুক
পরিপূর্ণ প্রবল প্রচুর ;
যৌবনের রসে ভরপুর।
মেঘ ডাকে কড়্ কড়্ বুঝি বা আসিবে ঝড়,
একটু নাহিকো ডর তাতে ;
উঘারি বুকের বাস, পূরায় মনের আশ
উরস পরশ করি হাতে।
অজানা ব্যথায় সুমধুর
সেথা বুঝি করে গুরুগুর।

যুবতী একেলা পথ চলে ;
পাশের পলাশ বনে কেন চায় অকারণে?
আবেশে চরণ দুটি টলে—
পায়ে-পায়ে বাধিয়া উপলে।
আপনার মনে যায় আপনার মনে গায়,
তবু কেন আনপানে টান?
করিতে রসের সৃষ্টি চাই কি দশের দৃষ্টি—
স্বরূপ জানেন ভগবান।

সহজে নাচিয়া যে বা চলে
একাকিনী ঘন বনতলে—
জানিনাকো তারো কী ব্যথায়
আঁখিজলে কাজল ভিজায়!

নেবুফুল

ছোট্ট নেবুর ফুলটি আমার, ছোট্ট নেবুর ফুল—
স্বর্ণ উষার কর্ণ ভূষার বর্ণ তুষার দুল!
চন্দ্রধবল সরস কান্তি
চন্দনজল পরশ শান্তি ;
মন্দমারুত বন্দনারত গন্ধ তব অতুল!

ছোট্ট নেবুর ফুল—
সন্ধ্যামুখের সৌরভী ভাষা,
বন্ধ্যা বুকের গৌরবী আশা,
গুপ্ত প্রেমের সুপ্ত পিয়াসা, বিরহের বুলবুল!

ছোট্ট নেবুর ফুল—
প্রথম প্রীতির সুমধুর স্মৃতি—ব্যথাভরা দুটি ভুল!
গন্ধপুরীর রাজকন্যার হীরার কর্ণদুল!

ছোট্ট নেবুর ফুল,
মুগ্ধ হিয়ার মন্দির তোরি মন্তরে মশ্‌গুল!

অনাগত

বরষের খেয়া বেয়ে বন্ধু মোর চৈত্ররাতি পারে
পার হয়ে গেল অন্ধকারে
বিদায়ের কোনো বাণী না কহিয়া কিছু,
নিঃশব্দ প্রশান্ত মুখে গেল শুধু মাথা করি নিচু।
সুখে দুঃখে বাঁধি ঘর—মোরা, যারা দীর্ঘ দিনে-রাতে
এতদিন ছিনু সাথে-সাথে,
স্তব্ধ রহিলাম বসি তীর প্রান্তে চাহিয়া সম্মুখে
ব্যথাতুর বুকে।

ধূসর বালুকাতটে নাহি আলো—নাহি অন্ধকার,
অস্পষ্ট উষার আলো ইঙ্গিতে জানায় বুঝি পার—
বহুদূরে মোহনার শেষে,
নক্ষত্রের রশ্মি ধরি বন্ধু মোর গিয়াছে যে দেশে!

নিশান্তের হিম বায়ু কাঁটা দিল আকাশের গায়ে,
নয়নে নামায়ে তন্দ্রা, অবসাদে অঙ্গটি জড়ায়ে!
তারি মাঝে, মনে হল, সহসা জাগিল কলতান,
উর্মিক্ষুব্ধ সাগরের গান—
ওই আসে,—ওই আসে, ওই বুঝি আসে অনাগত!
—নরনারী, মাথা কর নত।
দিগন্তে দুলিছে তারি মেঘে-মেঘে বিজয়-পতাকা—
পিঙ্গল শঙ্করজটা প্রলয়ের জ্বলদর্চি মাখা।

সুদূর সিন্ধুর বক্ষে ওই আসে, ওই আসে সে কি!
ভয়ে-ভয়ে দেখি—
ও কি রূপ ভীম ভয়ঙ্কর!
অতীত বন্ধুর মতো ও তো নহে প্রশান্ত সুন্দর।
ভ্রূকুটি-কুটিল ভালে, দূর থেকে, যেন যায় দেখা
উচ্ছ্বসিত সদ্য রক্ত-রেখা!

প্রচণ্ড ঘৃণার হাস্য স্ফুরিছে বিষণ্ণ আস্য 'পরে,
উচ্ছ্রিত সুদীর্ঘ বাহু উদ্ধৃত ত্রিশূল ধরি করে!
—এ কী রূপ, এ কী মূর্তি—এই অনাগত!
এই মানবের বন্ধু—সমুদ্ধত সংহার-উদ্যত?

তীরে নীরে চারিধারে তবু উঠে তারি জয় জয়,
ভয়ঙ্কর ভয়মাঝে কোন্ মন্ত্র বিতরে অভয়;
সিন্ধু তীরে সিন্ধুর উচ্ছ্বাসে
বিচিত্র শ্রমিকদল যন্ত্র হাতে ভিড় করি আসে,—
কৃষক লাঙল ধরি, তন্তুবায় তন্তু ধরি করে,
কর্মকার অভ্যর্থনা করে শ্রদ্ধা ভরে
হাতুড়ি তুলিয়া ঊর্ধ্বে নবাগত বীর পানে চাহি;
নিরন্ন লাঞ্ছিত ক্লিষ্ট—শিল্পীদল গান গাহি-গাহি
বরি লয় আগন্তুকে উদগ্র ইঙ্গিতে—
কর্কশের কোলাহলে বাঁধি যেন উন্মত্ত সংগীতে!

চোখ মেলি চেয়ে দেখি—বৈশাখের আতপ্ত প্রভাত
জলে স্থলে হানে যেন রুদ্রের প্রদীপ্ত রশ্মিপাত!
ছন্দে দ্বন্দ্বে নিরানন্দে কর্মীরা চলেছে সব কাজে!
—দূরে কোথা যন্ত্রকণ্ঠে প্রাহরিক বাজে!
দারুগন্ধী কৃষ্ণকায় ধীবরের দল
জলে ভাসাইয়া ভেলা করিছে উন্মত্ত কোলাহল!
সম্মুখে সুদূরে হোথা মগ্নপোত বেড়ি
সিন্ধু-শকুনের দল উড়ে ঘেরি-ঘেরি।
নানা দিকে, নানা বর্ণে—নানা সূত্র জালে
সৃষ্টির বয়ন চলে বিধাতার লীলা-তন্তুশালে।

চলিয়াছি ঘরে,—
অপূর্ব তন্দ্রার কথা বার-বার স্মরিয়া অন্তরে।
—ভাবিতেছি, এই যদি হয়,—
শিবের তপস্যা যদি রুদ্র হস্তে হয় সে অক্ষয়,
—নাহি ভয়, হোক্ জয়, হোক্ তারি জয়!

দুর্যোধন

দূর দিগন্তে সন্ধ্যাসায়রে
কালোয় মিলিছে রক্ত-রেখা ;
নিচে নির্জনে প্রান্তর 'পরে
কার ও মূর্তি লুটিছে একা?
—কে আমি, জানো না? ভুলিনি সে নাম-
রাজা আমি—রাজা দুর্যোধন ;
—কুরুক্ষেত্র হয়েছে কি শেষ,—
কোথা আমি,—একি দ্বৈপায়ন?
—মহিষি, মহিষি রানী-ভানুমতি,
কোথা গেলে সতি, দুঃসময়?
—রথ, মোর রথ—সারথি, সারথি,—
কই, কোথা গেল রক্ষিচয়?

—উহু—বড় ব্যথা, দারুণ যাতনা—
রাজবৈদ্যেরে কে আনে ডাকি?
রাজার বীর্য, বীরের ধৈর্য—
সেও আজি হার মানিবে নাকি!
—তবু, তবু আমি করি না শঙ্কা,
একাকী যুঝিব নির্বিকার ;
অধর্ম-রণে পরাজয় তবু
করিব সবলে অস্বীকার।

*   *   *

—হায়রে ভাগ্য! তাও যে পারি না,
ভগ্ন এ উরু ধুলায় লুটে ;
আশ্রয়হারা বীর্য আমার
হাহাকারে শুধু কাঁদিয়া উঠে!
—বৃকোদর, তুই পাণ্ডবগ্লানি,
পাণ্ডুর গালে লেপিলি কালি,—
চোরের মতন দহিলি ধর্মে
আপনার হাতে আগুন জ্বালি।
—ক্ষত্রবংশে অক্ষত্রিয়—
বায়ু পুত্রেরই প্রমাণ ঠিক,—
কলঙ্কী ওই পাণ্ডবনামে
ধিক্ ধিক্ তোর—শতেক ধিক্।

—বিশ্বে কি কারো চক্ষু ছিল না!—
        হায়রে বিশ্বে কেই-বা আছে?
ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ বিগত,—
        কে লবে শাস্তি কাহার কাছে?
—সবই সেই শঠ কৃষ্ণের কাজ,
        ক্রূর চক্রীর কুমন্ত্রণা ;—
'ধর্মরাজ্য, ধর্মরাজ্য'—
        মুখে যার বাণী-বিড়ম্বনা!
—কৃষ্ণের সাথে দুষ্টের দল
        সখা বলি যার দাস্য করে,
যদুবংশের সেই কলঙ্ক
        চালায় তাদেরই হাস্যভরে!
—কোথা বলরাম উদার-বীর্য—
        শুভ্রোজ্জ্বল রৈবতক?
কুলপাংশুল এই তার ভ্রাতা—
        পক্ষপাতী এ প্রবঞ্চক!
—উহু—সেই ব্যথা, আবার, আবার!
        —কে ও? কাছে এস, হে সঞ্জয়,
দুর্জয় তব দুর্যোধনের
        হের এই দশা-বিপর্যয়।
—কুরুকুল,—সে কি নির্মূল তবে,—
        কুরুক্ষেত্র ধ্বংস নাকি?
বল না মন্ত্রি ,—নিশ্চুপ কেন?
        বুঝিবার আর আছে কি বাকি!
—ভাবিতেছ মনে, দুর্যোধনেরে
        শুনাবে না সেই অশুভ কথা,—
হায়, তাত! এই মৃত্যুর কূলে
        আছে তার কোনো সার্থকতা?
—আজ মনে পড়ে—সেই সভাগৃহে
        পিতৃব্যের যুক্ত পাণি,—
এদিনের কথা সেদিন বুঝিলে,
        কহি তাঁরে সেই তিক্ত-বাণী?

—রাজ-বংশের সম্ভ্রম চাহি
        তবু কোনো তাপ নাহি এ মনে,—
দুর্যোধনের মর্যাদাবোধ
        কে না জানে তার শত্রুজনে?

—ধর্ম তাহার—কর্ম তাহার
রাজ-রাজেন্দ্র-যোগ্য সবি,—
মানী পেত মান, গুণী আহ্বান,
অর্থী ফিরিত অর্থ লভি!
—ওহো, সেই কথা? দ্যূত-ক্রীড়ার
ক্ষত্রাধিকার বিদিত লোকে—
কে বলিবে পাপ? কোনো অনুতাপ—
—বাষ্প তা লাগি নাহি এ চোখে!
—হিংসায় যদি গণ অপরাধ?
কাপুরুষ তুমি ;—সাক্ষ্য তার—
দেবতা-দৈত্যে নিত্য বিরোধ,
জ্ঞাতি হয়ে—কিবা বাক্য আর?
—হিংসা! জীবের সহজ ধর্ম—
হিংসা-অন্নে পুষ্ট প্রাণ,—
ধ্বংসে যে ছায়া কালের কাম্য,
বংশে তাহাই মূর্তিমান্!

—পাঞ্চালী-কথা?—তুলো না মন্ত্রি!—
পঞ্চপতি যে ভজনা করে,
যৌতুকসম কৌতুকে তার
চির অধিকার বিধির বরে!
—রাজার ধর্ম—সে যে গুরুতর,
কামের কামনা তাহার নয়,—
সারা জীবনের সে একনিষ্ঠা
তুমি জানো তাত, হে সঞ্জয়।
—কুন্তীতনয়, দ্রৌপদীপতি—
কী নির্যাতন কঠিন তার?
কুরুকুলপতি—রাজ্যে তাহার
সমদর্শী সে—বজ্রসার!

—সূচ্যগ্রের ভূমি দিই নাই
পাণ্ডবে?—সে কি কৃপণ বলে?
দুর্যোধনের উদার হস্ত
কে না জানে এই পৃথ্বিতলে!
—তা নয় মন্ত্রি,—ন্যায়ের দাবিতে
অধিকার চাহে শত্রুগণ!
প্রার্থনা হলে?—রাজ্য বিলায়ে
বঙ্গে চলে যেত দুর্যোধন।

—শুধু এক কথা—পারিনি ভুলিতে,
মন্ত্রি,—যা আজো বিঁধিছে মনে,-
অভিমন্যুর হীন হত্যা সে—
সপ্তরথীর আক্রমণে।
—উহু, সেই ব্যথা! উরু হতে উঠি
মস্তকে পশি ভুলায় সব!
অন্ধ নয়ন, ক্ষিপ্ত এ মন,
কর্ণে পশিছে প্রলয়-রব!
—মন্ত্রি, মন্ত্রি—সব ছেড়ে গেছে?
বৈদ্য কেহ কি নাহিকো আর?
—সংবাদ দাও, ডাকাও, ডাকাও—
এ কণ্ঠহার পুরস্কার।

ঊর্ধ্ব আকাশে সন্ধ্যা ঘনায়
প্রান্তরশিরে বনের পারে,
দূরে হ্রদজল কালো হয়ে আসে
ঘন ঘনায়িত অন্ধকারে।
কুরুক্ষেত্র-প্রান্তর ভরি
জ্বলে উঠে শত আলেয়া-আঁখি ;
নিশাচর যত হিংস্র শ্বাপদ
হুঙ্কার দিয়া ফিরিছে ডাকি।

—সঞ্জয়, তুমি রহ ক্ষণকাল,
হয়তো এ মোর শেষের রাতি!—
জয়-পরাজয়—প্রশ্ন সে নয়,
জানি, তা জীবের জীবন সাথী।
কোনো ক্ষোভ মোর নাহি এ জীবনে,
স্বভাব-রাজা এ দুর্যোধন ;
নিন্দা-খ্যাতির ঊর্ধ্বে তাহার
সর্বশাসন সিংহাসন!

—শত প্রণিপাত জানাইয়ো শুধু
পিতার চরণে মন্ত্রিবর,—
বোলো—আমি সেই মহৎ পিতার
মহিমান্বিত বংশধর।
মৃত্যুরে আমি সহজ গর্বে
নিত্যকালের ভৃত্য গনি,—

হরে সে জীবন, পারে না হরিতে
কীর্তি—যা তার চিরন্তনী।

—হউক পিতার নয়ন অন্ধ—
ভাগ্যের হাতে কি-বা না হয়?
পুত্রের 'পরে জানি স্নেহ তার
অপার, তবু সে অন্ধ নয়!
—সন্তান লাগি মঙ্গল মাগি
রাজ-শাসনের নিগড়ে বাঁধি
যুদ্ধের পথে লৌকিক মতে
পারিতেন তিনি হইতে বাদী ;
—মন্ত্রদাতার অভাব ছিল না,
—কৃষ্ণ, বিদুর, ভীষ্মবীর,—
পুত্রের 'পরে বিশ্বাসে তবু
শ্রদ্ধানত সে উচ্চ শির!
—কাপুরুষতার শান্তি হইতে
সংগ্রামও শ্রেয় নিত্যকাল,—
পুত্রস্নেহে সে রাজধর্ম
ভুলেননি সেই পৃথ্বীপাল!
—মানী পুত্রের মান্য পিতা যে—
মনশ্চক্ষে দিব্য-জ্যোতি ;—
চরণে তাঁহার তাই বার বার
দেহ-মনে আজি জানাই নতি।

রাত্রি ঘনায়,—বন্ধু বিদায়,
ফিরে যাও ঘরে প্রণাম লয়ে ;
দুর্যোধনের দৃপ্ত মহিমা
জাগুক শিয়রে সঙ্গী হয়ে।
বেদব্যাসের পূতনাম-যুত
দুলুক অদূরে দ্বৈপায়ন ;—
ক্ষাত্র তেজের দীপ্ত তারকা
জ্বলুক আঁধারে দুর্যোধন!

কর্ণ

—পাণ্ডুপুত্র সহোদর মোর?—কুন্তী আমার মাতা?
কর্ণের ভালে এ কী পরিহাস লিখিয়াছ, হে বিধাতা!
পৌরুষে শুধু সেবি নিশিদিন
যে কর্ণ চির সঙ্কোচহীন,
ভীষ্মসেবিত দুর্যোধনের শত্রুভয়ত্রাতা—
সেই শত্রু—সে সহোদর তার?—শত্রু-জননী মাতা!

নহে, কভু নহে—মানে না কর্ণ গুপ্ত সে অধিকার,—
কর্ণ পুরুষ, পৌরুষে শুধু স্বীয় ইতিহাস তার ;
কোথা তার পিতা? মাতা তার নাহি ;
একা সে চলেছে সম্মুখে চাহি—
খড়্গো-খোদিত দুর্গম পথে বীর্যের অভিসার ;
ধিকৃত কোনো দৈব অতীত কর্ণ মানে না তার।

ইন্দ্রের তেজ, শিবের শক্তি, কৃষ্ণের মন্ত্রণা—
ধনঞ্জয়ের ধার-করা ধনে গনে সে আবর্জনা!
অর্জনই তার একক বিত্ত,
কৈতবহীন স্বাধীন চিত্ত,
নিজ ভুজবলে করে সে নিত্য শক্তির আরাধনা ;
ধনঞ্জয়ের ধার-করা ধনে গনে সে আবর্জনা!

বসুন্ধরার বীর্য-শুল্কে শুধু তার প্রত্যয় ;
বাহু ছাড়া তাই কোনো বিক্রমে নাহি তার পরিচয় ;
কৌশলে?—তার চির ধিক্কার,
কারো কাছে কিছু নাহি ভিক্ষার—
কুণ্ডলসম সহজাত তার শক্তিব সঞ্চয়,
অক্ষয় তার কবচের মতো অক্ষত প্রত্যয়!

—পূর্ব-তোরণে দামামা বাজিল—আসে বা দুর্যোধন!
কল্য সমরে সেনাপতি মোরে করিবে, করেছে মন ;
নাহি সে ভীষ্ম—নাহি আচার্য,—
মোরই রক্ষিত এবে সে রাজ্য!
—সানন্দে তাই করিব গ্রাহ্য বন্ধুর আবেদন ;
পূর্ব-তোরণে ডঙ্কা পড়িল, আসিছে দুর্যোধন।

—বীর অর্জুন—বীর বটে মানি,—বুঝি মোরই সহোদর।
জীবনের ভার সঁপি গেল তার মাতা যে আমারি'পর ;
সেই সে কুন্তী—আমারো জননী!
জ্যেষ্ঠ পুত্রে শ্রেষ্ঠ সে গনি
পার্থের প্রাণ ভিক্ষা মাগিল জোড় করি দুটি কর,—
হোক্ বীর, তবু গাণ্ডিবী মোরই কনিষ্ঠ সহোদর।

মনে-মনে মাতা অর্জুনে জানি দুর্বল মোর কাছে,
দূর করি তার রানীর গর্ব তবে তো সে আসিয়াছে!
যা চেয়ে নারীর নাহি কলঙ্ক
যার বেশি তার নাহি আতঙ্ক—
মাতা হয়ে, হায়! প্রকাশিয়া তাই, কৃপা মোর যাচিয়াছে,—
দুর্বলতার সব কথা কহি সূতপুত্রের কাছে!

—হায়রে, বিধাতা, কী দারুণ লিপি লিখিলি কর্ণ-ভালে!
সুর-নরে কেবা কোথা পড়িয়াছে হেন সঙ্কট-জালে?
এক দিকে কাঁদে মায়ের মিনতি,
আর দিকে বাঁধে বন্ধু-বিনতি—
যে বন্ধু মোর অনন্যগতি আশ্রয় ইহ কালে ;
ভাগ্য-বিধাতা, একি সঙ্কট লিখিলি কর্ণ-ভালে!!

* * *

প্রভাতিলা নিশি কুরুক্ষেত্রে, পূর্ব-তোরণ পারে,
যুদ্ধের কাড়া ফিরে দিল সাড়া মিশি নব হাহাকারে!
সারা রজনীর অনিদ্রা শেষে
ভীষণ ভ্রুকুটি ভরি ভাল-দেশে
নমিলা কর্ণ সূর্যোদ্দেশে চাহি পূর্বাশা-পারে ;
প্রভাতিলা নিশি কুরুক্ষেত্রে, পূর্ব-শিবির দ্বারে।

—হে জবাকুসুমসঙ্কাশদ্যুতি, হে সবিতা! লহ নতি,
এ চিত্তভার নাশো আজিকার হানি ও বরজ্যোতি!
পার্থ-কীর্তি করিব বিজয়—
তব কাছে আজি প্রার্থনা নয়,
কর্ণের বাহু রক্ষিতে জানে আপনার সদ্‌গতি ;
এ আঁধারে শুধু পন্থা দেখাও, চরণে এ মিনতি।

কুন্তী জননী, পার্থ সোদর—করিনু অস্বীকার ;
মোরই 'পরে আজি অনন্যোপায় দুর্যোধনের ভার।

রাজ্য ও মান যে-বা দিল দীনে,
তারে ছাড়ি যাব হেন দুর্দিনে?
কৃতজ্ঞতার প্রতিদান ভুলি দাতা হবে দুরাচার!—
দুর্যোধনের আশ্রয় সে কি করিবে অস্বীকার?

না, না—তা হবে না, পাণ্ডবে মোরে বধিতেই আজি হবে
ভুবনে সে মোর প্রতিদ্বন্দ্বী—ত্রিলোকে জানে তা সবে!
দুর্মদ তার জয়ের গর্ব
আজিকারই রণে করিব খর্ব,
পার্থ-কীর্তি লুপ্ত করিয়া ফিরিব সগৌরবে ;—
অর্জুন-বধে দুর্জয় খ্যাতি অর্জিতে আজই হবে।

—আজ মনে পড়ে—রাজ-সভাতলে কৃষ্ণা-স্বয়ম্বর ;
পার্থের সেই অপমানে আজো জর্জর অন্তর!
কৌশলে জিনি মৎস্য-চক্র,
মোর পানে চাহি হাসিয়া বক্র,
ভুবনধন্য পাঞ্চালীধনে বরিল সে বর্বর,—
আজ মনে পড়ে সেই বঞ্চনা—কৃষ্ণা-স্বয়ম্বর!

—সেই বঞ্চক—গাণ্ডীববলে, ভাগ্যের ফলে তার,
কৃষ্ণ-সারথি—দেখায় কর্ণে বীর্য—অহঙ্কার!
না থাক্ ভাগ্য, বীর্যেরই বলে
পাড়িব পার্থে এই পদতলে,—
প্রতিজ্ঞা মোর এ ভূমণ্ডলে রোধিবে সাধ্য কার?
পার্থ-ভাগ্য ব্যর্থ করিয়া প্রতিশোধ লব তার।

—তবু, তবু মন বড় উচাটন মায়ের নয়ন-জলে,—
মাতা হয়ে সুতে ভিক্ষা মাগিল পড়িয়া চরণ তলে!
যে কর্ণ কাছে কারো কোনো দিন
কোনো প্রার্থনা নহে ফলহীন,—
পুত্র হয়ে সে জননীর ঋণ শুধিবে কি বাহু বলে!
বীর্য তাহার কিসে পাবে পার মায়ের চোখের জলে?

* * * *

অস্ত্র-আগারে প্রবেশিলা বীর করিতে যুদ্ধ সাজ ;
যুদ্ধশেষের শেষ সেনাপতি আজি সে অঙ্গরাজ।
সহজাত দুটি হেম-কুণ্ডলে
সহজ কবচে রবি কর ঝলে,

বাছি বাছি লয় সহস্রশর ভরি শরাসনে আজ ;
হস্তে বিজয়, ললাটে দীপ্তি—সূর্যেরই মতো সাজ।

—ওকি! কার ছায়া উঠিল ফুটিয়া সমুখে মুকুর 'পরে?
কর্ণ-জননী কুন্তী যে দেখি—নয়নে অশ্রু ঝরে।
পশ্চাতে ফিরি হেরিলা চকিতে,—
কেহ তো কোথাও নাহি চারিভিতে!
—একি মোহময় মহা বিস্ময়! শিহরিলা ক্ষণতরে ;
মুকুরের মাঝে মিলাইল ছায়া আপন মুখে 'পরে।

—নয়, কভু নয়,—এহেন সময় নাহি চিন্তার ঠাঁই ;
বীর্যবৃত্তি কর্ণের মনে করুণার ক্লেদ নাই!
সতেজ স্বাধীন চির-নির্ভয়,
কিণাঙ্কী কর জপে শুধু জয়,—
বিশ্বভুবনে পার্থ-গরিমা নির্জিত আজই চাই—
বীর্যবৃত্তি কর্ণ-চিত্তে করুণার নাহি ঠাঁই।

* * * *

দুর্মদ বেগে বাহিরিলা বীর পশিতে দীপ্ত রথে,
—কে রে ভিক্ষুক, আসিয়া দাঁড়ালি আগলি মধ্য-পথে?
—'হে বিশ্বজিৎ, হে দাতাকর্ণ,
কৃপার্থী কর চাহে সুবর্ণ—
কুণ্ডল আর কবচ তোমার,—দেহ দান গৃহাগতে।'
—অজানা ভিখারি, সহসা আসিয়া দাঁড়াল মধ্য-পথে!

থমকি থামিল কর্ণ—শুনি সে অদ্ভুত প্রার্থনা ;
—হায়রে, দৈব! এই শেষ দিনে—এ কী রে বিড়ম্বনা!
প্রতিজ্ঞা ছিল ভিক্ষা-পূরণ,—
সে মহা-সত্য জানে ত্রিভুবন,
সেই অপরাধে ভাগ্য কখন করিয়াছে মন্ত্রণা—
পার্থবিজয় ব্যর্থ করিবে—হায়রে বিড়ম্বনা।

ভিক্ষুকবেশী ব্রাহ্মণ পুনঃ কহে মিনতির স্বরে,—
'কর্ণ কি তবে সত্যে হানিবে আপন ধনুঃশরে?
প্রার্থনা মোর ফিরিয়া জানাই,
পূর্ণ না কর, বল—ফিরে যাই,
দাতা কর্ণের মিথ্যা বড়াই বুঝি লয়ে অন্তরে'
ব্রাহ্মণবেশী ভিক্ষুক পুনঃ কহিল তীক্ষ্ণ স্বরে।

কবচের সাথে কুণ্ডল বীর ছিঁড়িতে কঠিন হাতে—
আকর্ণ ভরি অদ্ভুত হাসি দেখা দিলা অজ্ঞাতে!
মনে মনে ভাবে—এই তো সুযোগ,—
স্বর্গে মর্ত্যে যেথা অভিযোগ,
শক্তি সেখানে শুধু দুর্ভোগ অমোঘ ভাগ্য-হাতে!
—কর্ণের মুখে অদ্ভুত হাসি দেখা দিলা অজ্ঞাতে।

—এই তো—এই তো সূর্যালোকিত মোরই প্রার্থিত পথ,
ভাগ্যের বরে সার্থক হোক্ কুন্তীর মনোরথ!
বাঁচুক পার্থ—জ্যেষ্ঠ তো আমি,
শোণিতের সাথে কল্যাণকামী,—
যে স্নেহ-নিঝর অন্তরগামী, রোধে না তা পর্বত!
সম্মুখে মোর এই তো পেয়েছি শান্তির মহাপথ!

—জননী কুন্তী, পুত্রের হাতে লহ প্রার্থিত দান,—
বঞ্চিত যেবা মাতৃস্বর্গে, সে আজি ত্যজিবে প্রাণ!
আদেশ তোমার—বাঁচুক পার্থ!
—তাই হবে মাতা ; কর কৃতার্থ
ভাগ্য-নিহত সূতপুত্রের বীর্যের অভিমান ;
জননী কুন্তী, পাণ্ডব মাতা, লহ তার শেষ দান।

চালাও শল্য, ত্বরা লহ রথ—যেথা সে পার্থ আছে
শেষ প্রণিপাত লহ দিননাথ আজি কর্ণের কাছে ;
—সবই তো সমান—জয় পরাজয়—
অর্জুন-বধ—আত্ম-বিলয়!
—ভাগ্যের হাতে সবই অভিনয়—কর্ণ তা বুঝিয়াছে ;
—চালাও শল্য—দ্রুত, দ্রুততর—পার্থ যেথায় আছে।

ভক্ত ভোলা

ভক্ত ভোলা তীর্থযাত্রী বন্ধুজন সাথে ;—
বহুদিবসের বাঞ্ছা হেরি জগন্নাথে
সার্থক করিবে আঁখি ;—সম্মুখেতে রথ,
অসংখ্য যাত্রীতে ভরা শ্রীক্ষেত্রের পথ।

কত নদী, কত মাঠ, কত বনচ্ছায়—
সুদীর্ঘ সরণি ধরি পার হয়ে যায়
পায়ে পায়ে। মন বাঁধা যে রথের সনে,—
পথের যাতনা যত লাগেনাকো মনে।

যেথায় ঘনায় রাত্রি, সেইখানে থামে ;
অজস্র লোকের ভিড় দক্ষিণে ও বামে—
দরিদ্র মানব-মেলা জুটে চারিধারে,
দেবালয়ে পান্থাবাসে কাতারে-কাতারে।

কারো বা মিলে না অন্ন, নিঃসম্বল কেহ ;
বৃক্ষতলে পথে কারো রোগাক্রান্ত দেহ—
লুটিছে কাতর কণ্ঠে ফুকারিয়া জল ;
সেবা লাগি থামে ভোলা বিষণ্ণ বিহ্বল।
কেহ-বা এগিয়ে চলে, কেহ পড়ে পিছে ;
কারো মন গৃহপানে ফিরিয়া চাহিছে—
পথশ্রমে, বর্ষাজলে উদ্‌ভ্রান্ত কাতর ;
সঙ্গীর উৎসাহে শুধু চলে করি ভর।

২

সেবারে দুর্ভিক্ষ ভারি উৎকল-প্রদেশে ;
সম্মুখে সুভদ্রাগড় ; অনাহারে ক্লেশে
সেথায় মরিছে লোক ; কেহ বা পলায়ে
ছুটিছে বঙ্গের পথে জঠরের দায়ে।
—দু-ধারেরই জনস্রোত জলস্রোতাকারে
মিশিতেছে পরস্পরে পথের দু-ধারে ;—
পথেই যেন বা রথ—হেন গণ্ডগোল!
আগে পিছে উচ্চকণ্ঠে উঠে হরিবোল।

চলেছে যাত্রীর দল তথাপি উৎসাহে ;
ভোলা শুধু নিরুৎসাহে চারিপাশে চাহে—
হেরি মানবের দুঃখ ; স্মরি নারায়ণ—
বাঁধিতে পারে না তবু বিপর্যস্ত মন।
বন্ধু কহে, আছে আর মোট দিন ছয়,
এইবারে ক্ষিপ্রপদে না চলিলে নয় ;
তব সাথে তীর্থপথে চলা—দেখি, ভার ;
—পরের দুঃখের খোঁজে কী কাজ তোমার?

অপ্রতিভ ভোলা বলে,—এই চল যাই,
কতই বিলম্ব হবে? বেশি দেরি নাই ;
মেয়েটার জ্বরটুকু ছাড়ে যদি রাতে,
গোবিন্দের নাম নিয়ে পালাব প্রভাতে।

৩

ভদ্রাগড়ে সন্ধ্যা নামে—ঠিক পরদিন ;
দ্রুত চলি দুই বন্ধু চলৎশক্তিহীন!
আহারে বিশ্রামে তবু মিলেনাকো ঠাঁই,—
এমনই দেশের দশা—উপায়ও যে নাই।
দুর্ভিক্ষের সহচরী মহামারী আসি
সুবিস্তীর্ণ জনপদ দিয়া গেছে নাশি।
সুস্থ যারা—পলায়িত, শুধু রুগ্ণজন
নিরুপায় পড়ে আছে চাহিয়া মরণ!

যে শূন্য মন্দিরে দোঁহে রজনী কাটায়,
তারি পাশে শেষরাত্রে শব্দ শোনা যায়—
যেন রুদ্ধ হাহাকার মৃত্যুর পরশে!
নিদ্রিত বন্ধুর কানে সে শব্দ না পশে।

ভোলা উঠি তাড়াতাড়ি হইল বাহির,—
আপন কর্তব্য তার করি লয়ে স্থির
মনে মনে। বন্ধুরে সে জাগাল না আর,
না করিয়া মিথ্যা সৃষ্টি নূতন বাধার।

প্রভাতে জাগিয়া বন্ধু চাহে চারিধারে,—
কোথাও নাহিকো ভোলা,—বিস্ময় পাথারে
রহিল অবাক হয়ে সারা দিনে রাতে ;
হতাশে একাকী যাত্রা করিল প্রভাতে।

৪

ভোলার কষ্টের আর রহিল না পার ;
অশ্রু-চক্ষে হেরে সে যে কৃষি-পরিবার,—
মরণে দু-জন তারা শান্তি লভিয়াছে!
স্ত্রীলোক বালক যারা উপবাসী আছে,—
তাদেরও মৃত্যুর বড় নাই বেশি দিন ;
পুরুষের মধ্যে বাকি ছিল যে প্রবীণ,
সংক্ষেপে তাহার কাছে শুনি সমাচার
দ্রুতপদে বাহিরে সে চিন্তি প্রতিকার।

আপন পাথেয় হতে, যাহা প্রয়োজন,
দীর্ঘপথ ঘুরি কষ্টে করি আহরণ,
লাগিল সেবার কার্যে হয়ে একমনা—
গোবিন্দের পদে সঁপি তীর্থের ভাবনা।

সে রাত্রে দেখে সে স্বপ্ন—যেন চারিধারে
অজস্র আর্তের মেলা ; তাহারি মাঝারে
চলেছেন জগবন্ধু হেঁটে খালি-পায়ে ;—
ভোলারে দেখিয়া—লন দু-বাহু জড়ায়ে!

কাটিল সপ্তাহকাল,—পক্ষ কেটে যায় ;
ধীরে ধীরে ক্লান্তিহীন কর্ম ব্যবস্থায়,
সঞ্চিত পাথেয় বলে, দুঃস্থ পরিবার
উঠে ক্রমে সুস্থ হয়ে সাহায্যে তাহার।

সময়ে সকলই হয়—পড়ে যারা, উঠে,—
আনন্দে শিশুর কণ্ঠে কলধ্বনি ফুটে,
নর ফিরে কাজ করে, নারী উঠে হেসে ;—
দেখি দেশে ফিরে ভোলা আষাঢ়ের শেষে।

৫

সবাই শুধায়,—কিহে, দেখে এলে রথ?
মৃদু হাসি কহে ভক্ত—দেখে এনু পথ ;—
রথের না পেনু দেখা মানুষের ভিড়ে ;—
সবই কপালের লেখা, এনু তাই ফিরে!

—বল কিহে?—ওহো! তা যে বলিবার নয় ;-
তীর্থকথা মুখে নিলে অপরাধ হয়!
ভালো, তব বন্ধু কোথা—ফেরেনি তো ঘরে!
আরো কোথা গেল বুঝি, পুরী হতে পারে?

ভক্ত ভোলা হেসে শুধু নিজ কাজে যায় ;
আরো এক পক্ষ কাটে বন্ধুর আশায়।
ভাবে সে, চাহিব ক্ষমা, আসুক্ তো আগে ;
ভাঙিতে বন্ধুর রাগ কতক্ষণ লাগে!

৬

শ্রাবণে ফিরিল বন্ধু আপন আলয়ে ;
ভোলার নিকটে গিয়া ক্রোধভরে কহে—

মধ্যপথে ছেড়ে যাবে—ছিল যদি মনে,
কী কাজ একত্র তবে যাওয়া মোর সনে?
ভোলা কহে—ছাড়িয়াছি বটে মাঝপথে,—
তবে কিনা—আমি ভাই যাইনি তো রথে!
মধ্য পথে অন্য কাজে বাঁধি মোর হাত,
আমারে ফিরায়ে দিল দেব জগন্নাথ!
মিথ্যাবাদী! মোর সঙ্গে এই ব্যবহার!
দেখিনু তোমারে আমি তিন-তিন বার,
রথের সিঁড়ির 'পরে ঠাকুরের নিচে,—
আমারে ভুলাতে চাও ধাপ্পা দিয়ে মিছে!
—শুধু চোখে দেখা নয়,—এগিয়ে সেখানে
চীৎকারি ডাকিনু কত—শুনিলে না কানে!
দারুণ লোকের ভিড়ে নারিনু ধরিতে,
বারবার ব্যর্থ হয়ে হইল ফিরিতে।

অশ্রুনীরে তিতি ভক্ত কহে পুনরায়—
মোটেই পুরীতে আমি যাইনি তো ভাই ;
ভদ্রাগড়ে ছিনু পড়ে একপক্ষ কাল ;
—তীর্থ লাগি মিথ্যা কব?—হায়রে কপাল!

—কেন বাড়াইছ মিথ্যা, কিবা প্রয়োজন?
এর আগে নীচতা তো দেখিনি এমন!
তিন-তিন বার নিজে দেখিলাম চোখে—
প্রভুর পায়ের কাছে! তবু যাও বকে!

শুনি ভক্ত লুটাইয়া পড়ে ভূমিতলে,
ভাবিয়া প্রভুর কাণ্ড, ভাসি নেত্রজলে।
ভক্ত আর ভক্তবন্ধু ভিন্ন কথা কয় ;—
কার সত্য—সত্যি সত্য—কে করে নিশ্চয়!*

দুঃখবাদী বন্ধুর প্রতি

বন্ধু, বারেক চোখ চেয়ে দেখ—উঠে পূর্ণিমা-চাঁদ,
আকাশের তীরে মুছে যায় ধীরে আঁধারের অপরাধ।

---

*টলস্টলের অনুসরণে।

তিথিতে তিথিতে জমে যে বেদনা মরিল সূতিকা ঘরে,
তারি বুক চিরে—হের কী মানিক জ্বলিল তোমারি ঘরে,
—সোনার চশমা, খুঁজে যা পাওনি, ওই দেখ তাকে তোলা,
মশলার ডিবে—ওই তো সমুখে, এই দেখ আল্‌বোলা ;
হারানো চটির পাটি-টি লুটায় দূরে ওই আঙিনাতে,—
পেয়েছ তো সব,—এইবার উঠে চল দেখি ভাই ছাতে ;
—নাই-নাই-নাই! বালাই, বালাই—নাই কি বলিতে আছে?
এখানে, না-হয় ওখানে আছে তা, হয় দূরে, নয় কাছে।

একটু দাঁড়াও—এই কোণটায় বিছাইয়া দিই পাটি,
রোসো রোসো ভাই—সেজে দিই তব সাধের আল্‌বোলাটি ;
দিব্য আরামে বসো তো বন্ধু, মেজাজটা করি মিঠে,
মোলাম করিয়া আনো ক্ষণতরে ওই খর-দৃষ্টিটে।
সুপ্তিদাত্রী এ হেন রাত্রি, এমন স্নিগ্ধ আলো,—
জান তো বন্ধু, বক্ষে তাহারো আছে কতখানি কালো!
—ওই দীপ্তির পিছনে লুকায়ে কত অতৃপ্তি-দাহ—
নিয়তির রীতি মানি হাসিমুখে ব্রতে করে নির্বাহ ;
জানে—এর পারে উদিবে তপন, জানে—পিছে আছে অমা,
তবু সুখে-দুখে ওই তো সমুখে হাসে চিরমনোরমা।

কুহুনিশীথিনী কে স্মরিবে আজি এমন চাঁদিনী রাতে?
তাই বলে সে কি উঠিবে না আর আকাশের আঙিনাতে!
আজি এ আলোকে পড়েনাকো চোখে হারানো যে কটি তারা,
—ভেবেছ কি মনে, অমার গহনে তারা চির-জ্যোতি হারা?
সম্মুখে যার মিলেনাকো দেখা, পশ্চাতে তাই আছে,
পিছু ফিরে দেখ—সেই জ্বলজ্বলে জ্বলিছে বুকের কাছে!
যে চোখের আলো পলকে মিলায় সুপ্তির আবরণে,
তার মাপকাঠি এতই কি খাঁটি—অনন্ত এ জীবনে?
মন মন করে যে অহঙ্কারে কথা কহ থাকি-থাকি—
শুধাই তোমায়, সেই মনটারই সত্য স্বরূপটা কী?

তার বাঁধা নাই যে মনোবীণায়, নাহি যার সুরবোধ,
ললিত বিভাস ভৈঁরো যে তার ভৈরব দুর্বোধ!
ব্যথা বোধ আর সুর বোধে দোঁহে জ্ঞাতি নহে কাছাকাছি ;—
চোখ থেকে তবু মধু ছেড়ে ক্রেদে ঘুরে না কি কানামাছি?
হাই তুলিছ যে—ঘুম এল নাকি,—বালিসটা দিব এনে?
চৈত্র হাওয়ায় দরকার নাই কাঁথা-কম্বল টেনে।

হেনার ঝাড়টা আচ্ছা বেহায়া—টবে থেকে খায় দোল,
মৃদু দখিনায় তোমারই ভাষায় তুলিয়া আর্তরোল!
নাকে ঢোকে তারই গন্ধের ব্যথা—চোখে দেখা যায় দেহ,
এত ব্যথা-বহা রূপটি কিন্তু মনে আনে সন্দেহ।

কথাই কওনা—চটে গেলে নাকি? অথবা এসেছে ঘুম
নয়নতারায় মুদিয়া দিল কি গন্ধ-ধূপের ধূম।
সুখ জেগে থাকে, দুঃখ ঘুমায়—শেষে কি বুঝিবে তাই?
চিরবিরহীরে তাই কি রাত্রে ডেকে সাড়া নাহি পাই।
আসল কথা কি,—যতখানি সুখ—ঠিক ততোখানি দুখ,
দিনরাত্রির আলোয়-কালোয় যেমন কালের মুখ।
সুখী বলে তাই সুযোগ পেয়েছ দুঃখেরে জানিবার,
নহিলে দুঃখে চিনিতে চক্ষে থাকিত না অধিকার।
পূর্ণিমা-রাত, হেনার গন্ধ—সুমন্দ দখিনায়,—
বন্ধুর নাকে বেদনার শাঁকে—মিছে বকে মরি, হায়।

একা নিরুপায় বসে ভাবি তাই—দুখ লাগে কেন গুরু ;—
দুখের চামড়া পাতলা আর কি সুখের চামড়া পুরু?
জন্ম হইতে সুখ পেয়ে, সুখে হয়ে যাই উদাসীন,
অনভ্যাসের পাতলা চর্মে ব্যথা করে চিনচিন!
মাতার স্তন্যে জন্মপুষ্ট ; পিতা পোষে বহুকাল,
শৈশব হতে শিখিতে হয় না ভাবনার জঞ্জাল ;
পনেরো আনারই অভাবের বোধ যৌবনে উঠে জেগে,
নূতন গজানো পাতলা চর্মে কামনার হাওয়া লেগে!
দুঃখের তাই সর্বদা খাঁই, সুখের মেলে না তো ভাত,
সুখের দিবস তবু চলে যায়, দুঃখের কাটে না রাত।

চোখ তুলে দেখি—আকাশের চাঁদ ঢাকা পড়িয়াছে মেঘে.
একবার করে হাবুডুবু খায়, আর-বার উঠে জেগে ;
শঙ্কর-শিরে চিরঠাঁই যার—দীপ্তি দেবতা শশী,—
সেও আপনারে বজায় রাখিতে মাঝে মাঝে মাখে মসী।
হাওয়ার দেবতা পবন—তাহার দেখিবারে চাঁদমুখ,
ঘোমটা টানিয়া ঘোমটা খুলিয়া করে চির-কৌতুক।
বুড়া শিব—সে তো ব্যাজার হইয়া সৃষ্টি করে না রোধ,
—ন্যাংটা পাগল সন্ন্যাসী, দেখি—তারো আছে রসবোধ!
সুখেরই লাগিয়া দুখের সৃষ্টি—উঁচু আছে বলে নিচু,
জীবনের পথ মুক্ত যখন, আছে আগু আছে পিছু।

ভাটিয়ালি

আমি ও আমার প্রিয়ার মাঝারে
যে ছোট নদীটি বহে,
কত ছলে সে যে তাহারই কথাটি
কানে কানে মোর কহে!
কলকলি আসে, খলখলি হাসে,
ছলছলি যায় চলি ;
কেহ না বুঝুক, আমি যে বুঝি না—
সে কথা কেমনে বলি?

এপারে নদীর খরবেগখানি
কূলের কোলটি ঘেঁসে,
ওপারের জল অতল শীতল
তটের প্রান্তদেশে ;
এদিকের চর তৃষিত ঊষর—
তৃণহীন বালুময়,
লতাপাতা ফুলে ভরা আন-কূলে
অসীমের বিস্ময়!

নদীর ওপারে খানিক ওধারে
উজানে প্রিয়ার বাস,
ভাটিমুখে তাই সংবাদ পাই
নিতি-নিতি বারোমাস!
রঙিন শাড়িটি কবেই-বা কাচে,
মাথাটি ঘষে বা কবে,—
সাথে-সাথে তার বারতাটি আসে
বর্ণে ও সৌরভে!

ভেসে আসা তার চুলের ফুলটি
কভু বা ধরিয়া রাখি,
ধরিতে পারি না জল-তরঙ্গে
সঙ্গের কথাটি কী!
ইঙ্গিতে আর ভঙ্গিতে ভরি
যত ভাবি সেই কথা,
চঞ্চল জলে ততো ছলছলে
পারের মন্থরতা!

সন্ধেবেলায় সহজ লীলায়
যে ঘট সেথা সে ভরে,
ঢেউখানি তার কেঁপে-কেঁপে লাগে
এপারের বালুচরে ;
সেথায় বাগানে কোকিল ডাকিলে,
হেথায় হেনার ঝাড়ে
ফুটি উঠে ফুল গন্ধে আকুল—
রাতের অন্ধকারে।

চখা-চখি যারা চরে এই চরে,—
সন্ধ্যার কিনারায়,
চরণ-চিহ্ন রাখিয়া এপারে
ওপারে উড়িয়া যায় ;
জানি না—সেথা কি সুধার সায়র
আছে ওপারের কোলে,
দিনের পাখিরে রাতে যা ভুলায়ে
উন্মনা করে তোলে!

জলের কিনারে সারারাত ধরে
পেতে বসে থাকি জাল,
রাতের আঁধার মুছে দিয়ে যায়
মনের অন্তরাল ;
চোখের বালাই কিছু যবে নাই,—
ঘুচে যায় দূরে-কাছে,
নিশার মশারিতলে ভাবি—প্রিয়া
মোরই পাশে শুয়ে আছে!

পায়ের তলায় দোল দিয়ে যায়
চির পরিচিত ঢেউ,
থম্‌থমে রাত, লুকায়ে কোথাও
দেখিবার নাহি কেউ ;
ফিস্‌ফিস্‌ করে সেই ফাঁকে তারে
বলে নিই যত কথা,
দিনে বড় বাধা—রাতের আঁধারে
জানাই প্রাণের ব্যথা।

মাছের আওয়াজে মোহ ভেঙে যায়,
চোখ মেলে দেখি চেয়ে,-
কোলের নদীটি কালেরই মতন
চুপি চুপি চলে বেয়ে ;
গাঙ্-চিলেদের কলরব উঠে
ওপারের ঝাউ বনে,
বাঁশের মাচায় রাত কেটে যায়
তন্দ্রায় জাগরণে!

উষা-বধূ আসি সোনার ঝাঁটায়
করে সংমার্জনা—
গগনাঙ্গনে জমে-ওঠা কালো—
রাতের আবর্জনা ;
ফুটে ওঠে যত পরিচিত রূপ—
নদী, নদী-পরপার,
তারি সাথে সেই চিরমোহময়ী
মূর্তিটি কামনার!

তরীখানি মোর নদী-কোলে-কোলে
বৃথায় ঘুরিয়া মরে,
ছোট বুকে তার ঠাঁই হওয়া ভার,
দু-জন নাহিকো ধরে ;
চির-নিরুপায় একা বাহি তাই
একক প্রাণের বোঝা—
লবণ সাগরে এ যেন হয়েছে
তৃষ্ণার বারি খোঁজা।

তাই যদি হয়, মনে ভাবি আরো
উজানে বাঁধিব ঘর,
নদীমুখে তারে তবু তো জানাতে
পারিব এ অন্তর!
যতদিন এই খর বেগখানি
বহিবে নদীর জলে,
ভাটিয়ালি সুর ধ্বনিবে বিধুর
পারের অতলতলে।

সন্ন্যাসী

ওগো সন্ন্যাসী, ওগো উদাসীন, মিনতি তোমার কাছে,—
বল একবার, জীবনে তোমার—কী ধন চাওয়ার আছে?
গিরিগুহাতলে আসন পেতেছ ঘন অরণ্যমাঝে,
নরের দৃষ্টি—সমাজের আঁখি—সহিবারে পারে না যে!
বিষয়বাসনা বিষেরই মতন ত্যজিয়া গিয়াছ চলি
ধূলিসম এই ধরণীর মায়া হেলায় দু-পায়ে দলি ;
বনের পশুরে সঙ্গী করেছ, সাথী বনতরুলতা,
মুখের বাণীরে বন্ধ করেছ বন্দিয়া নীরবতা!
ঘন জটাজালে ঢাকি চারু কেশ, ললাটে ভস্ম মাখি
প্রকৃতির পানে রুধেছ সবলে প্রকৃতিরই দেওয়া আঁখি ;
—সব ডাকাডাকি ছাড়িয়া গোপনে কারে ডাকি দিবারাতি
কাটাইছ কাল—কিসের আশায়, পাষাণে আসন পাতি?

কে তোমারে প্রভু জন্ম দিয়াছে, ছিল না কি মাতাপিতা—
সুখ-শৈশব কাদের অঙ্কে কাটিয়াছে জান কি তা?
ও কঠিন দেহ পুষ্টি লভিল কাদের অন্নে-জলে,
কার কাছে তব দেবতার নাম শিখেছ কৌতূহলে?
অসহায় দেহ, অশরণ মন—কোন্ সমাজের স্নেহে
বাড়িয়া উঠেছে কোন্ পল্লীর কোন্ অকরুণ গেহে?
কাহার বক্ষে চরণ ফেলিয়া ছাড়িয়া এসেছ কারে
কাহাদের কথা বিপুল যত্নে ভুলিয়াছ একেবারে!
কৃতজ্ঞতার কোনো অধিকার কারো বুঝি তার আছে,—
তাই কি সুদূরে সরিয়া এসেছ দেখা পাও কারো পাছে!
ধরণীর স্নেহে তরণী করিয়া সরণী হয়েছ পার,
—কিসের নৌকো, কে-বা তার মাঝি? ধারো না কাহারো ধার।

বুড়া বিধাতার ভুল হয়েছিল—মানবের গৃহবাসে
মানুষ করিয়া পাঠালো তোমায় না বুঝে এ পরিহাসে?
কেমনে চিনিবে অন্তর তব—মর্মবাসনা গূঢ়—
পাষাণের মাঝে পাথর তোমারে গড়িতে পারেনি মূঢ়!
কে জানিত আগে, মুক্তির লোভে শুধিবারে দেবঋণ,
পিতৃঋণেরে এতবড় ফাঁকি দিতে পারে কোনো দীন?
মায়ের ভায়ের স্নেহ—সে তো মায়া, মিছে সমাজের দাবি—
দেশ—সে তো মাটি—অন্নে তাহার কোথা মুক্তির চাবি!
তোমার মোক্ষ তোমারি সে শুধু—স্বীয় সাধনার ধন,—
দশজনে টেনে রাখিবে তোমারে মায়ায় ভুলায়ে মন?

এত বড় 'ছোট' নহ তুমি দেব,—ধরণীর মোহে ভুলি
তোমার স্বর্গ পরের কথায় 'শিকায় রাখিবে তুলি'!

ধিক্ সন্ন্যাসী, ধিক্ উদাসীন, ধিক্ হে মুক্তিকামী,
শ্রীপদে তোমার শতবার ধিক্—হে মোক্ষ পথগামী!
মানুষের ঘরে মানুষ হবার যোগ্যতা নাহি যার,
স্বর্গের লোভ সাজে কি তাহার—দেবতার অধিকার!
পিতা কাঁদে ভুঁয়ে, মাতা পথে শুয়ে মুমূর্ষু গৃহহীন,
ক্ষুধা অপরাধে ভাইবোন কাঁদে—নিজবাসে পরাধীন!
তুমি খুঁজিতেছ আপনার পথ, ভাবিয়া তাদের মায়া,
যাদের মায়ায় মানুষ হয়েছ, যাদেরি রক্তে কায়া!
হায় কাপুরুষ, হায় পলাতক, হায় ভীরু, হা রে দীন?
স্বার্থ-আশায় মনুষ্যত্বে এত বড় উদাসীন—
সহিতে পারেন শুধু তিনি—যার আকণ্ঠ ভরা বিষে,
মানুষের 'পরে হেন পরিহাস মানুষ সহিবে কিসে?

সন্ন্যাসী শিব—বিশ্বের শিবে আছেন চক্ষু বুজি—
গৃহিণীরে দিয়ে অন্নের ভার—অর্থ তাহার বুঝি ;
পূর্বপুরুষে উদ্ধার লাগি সন্ন্যাসী ভগীরথ,
সগরবংশে স্বর্গে বহিল তাহার পুণ্যরথ ;
বুদ্ধ নিমাই—মানুষেরই ভাই, জীবের মুক্তি লাগি
দুঃখ-দূরের পন্থা খুঁজেছে গৃহহীন বৈরাগী ;
জানি শঙ্কর ব্রহ্মচর্য, বুঝি তার মায়াবাদ—
রামকৃষ্ণের সেবাধর্মের জগৎ চিনেছে স্বাদ ;
—তব ভাণ্ডারে কোন্ সে বিত্ত সঞ্চিছ কার তরে?
স্বার্থ-সাধনা-ছদ্মের বেশে ভুলাইবে কোন্ নরে!
যাহারে ডাকিয়া ভস্ম মাখিয়া কাটাইছ নিশিদিন—
জেনো—ধরা তাঁর স্নেহেরই আগার—তিনি নন উদাসীন!

পাঞ্চজন্য

দুখে গাঁথা এই জীবনের মালা, তবু এরে ভালো লাগে ;—
কালো আকাশের অন্ধ বেদনা রঞ্জিত উষারাগে!
গন্ধ বিলায়ে ঝরে পড়ে ফুল সন্ধ্যার কিনারায়,
নিশি না পোহাতে মরে যায় হাওয়া দখিনের জানালায় ;
বৌ-কথা-কও সুরের আবেশে বধূ ধীরে মেলে আঁখি,
বাতায়নপাশে ঘোম্‌টা খুলিতে দেখে—উড়ে গেছে পাখি!
এই তো জীবন, তবু এরে, হায় ভালো লাগে, ভালো লাগে
কোন্‌ সে বাসনা রাঙা হয়ে ফুটে বক্ষের গুল্‌বাগে!

বর্ষার জল নামিয়া গিয়াছে, জাগিয়া উঠেছে চর,
কাঁচা রোদখানি বালুকার বুকে চিক্কণ ভাস্বর ;
নূতন গজানো বাব্‌লার বনে বাসা বাঁধিয়াছে পাখি,
চখাচখীদের চরণ-চিহ্ন তলে কে দিল রে আঁকি!
বুনো ঝাউয়েদের বুকের ঝুরিতে উদাসীন মেঠো হাওয়া,
কী ধন খুঁজিতে ঘুরে মরে যেন দিবসে নিশিতে-পাওয়া,
দূরে দূরে মাঠ ভরিয়া উঠেছে শ্যামল শস্যভারে,
কৃষাণের বধূ থালা লয়ে হাতে হেসে উঠে হেরি কারে!
কোন্‌ অচেনার চপল চরণে জানাতে মিনতি তার,
জেলের যুবতী জালের সঙ্গে বুনিতেছে গীতিহার!
আজি এ প্রভাতে জাগিয়াছে প্রাণ, জীবন আমার ধন্য ;—
বুঝিয়াছি আজ জীবনের কাজ নহে সে নিজের জন্য।
কালো আকাশের বুকের আঁধার দিবালোকে লভে দীপ্তি,
যেন সে-ই বলে ভরি উঠে প্রেম—সবার সেবার তৃপ্তি।
ঘর করি পর, পর করি ঘর, হারায়ে আপন লক্ষ্য,
আকাশ পেয়েছে উদার চক্ষু, সাগর অপার বক্ষ ;
তারি পানে চেয়ে আজি এ পরান লভিল কি মোর মুক্তি?
মুক্তার মালা ঠেকিল কি হাতে ঘাটে ঘাটে ঘাঁটি শুক্তি!
পাঁচজনে ডেকে পঞ্চমে তাই কাঁদে এ পাঞ্চজন্য—
সব যে আমার, আমি যে সবার—ধন্য রে আমি ধন্য।

পুরাতনী

আমার কবিতা-লক্ষ্মী—জানি আমি নহেকো সুন্দরী,
ভুলে যাহে নবীন নয়ন,
অপাঙ্গের দৃষ্টি তার প্রগল্‌ভেরে মন্ত্রাহত করি
মুহূর্তে হরিতে নারে মন ;
নাহি তার কটাক্ষেতে সৃষ্টিজয়ী তড়িৎ-উল্লাস,
মুখে তার নাহি বজ্রবাণী,
গতিতে হিন্দোল-ছন্দ-তরঙ্গের ফেনিল উচ্ছ্বাস
দুলায় না প্রমত্ত পরানী ;
অজানার ইশারায় নাহি তার উৎকট উৎসাহ,
অচেনায় উগ্র আকর্ষণ,
ভাষে বা অভাষে কভু অন্তরের বিদ্যুৎপ্রবাহ
ছাপায় না দেহের বন্ধন ;
মানবের গৃহধর্মে—চিত্তবেগে দিয়া জলাঞ্জলি
অকূলে সে ভাসায় না ভেলা,
উদ্বেল অঞ্চল তার মন্দবাতে উঠে না চঞ্চলি
সীমার বন্ধনে করি হেলা ;
বাসনার বিষ তার বহেনাকো নাসার নিঃশ্বাসে,
কৃষ্ণকেশে কামনার ফাঁস,
শ্রদ্ধাহীন তীক্ষ্ণবাণী মানুষের শাশ্বত বিশ্বাসে
হানে না নিষ্ঠুর পরিহাস ;
মনের দোহাই দিয়ে আত্মারে করে না অপমান
দেহের দুয়ারে বাঁধি হাট,
বিমূঢ় বচন-ছন্দে ভুলাইয়া তরুণের কা[illegible]
রচে না বিলাস-নাট্য-নাট।
আমার কবিতা-রানী রূপধন্যা নহে স্বতন্তরা,
লুব্ধ আঁখি দিবস রজনী ;
অনন্ত আনন্দময়ী শুচিশুদ্ধ প্রশান্ত অন্তরা
সে যে লক্ষ্মী চিরপুরাতনী ;
একাধারে মাতা ভগ্নী বধূ কন্যা দেবতা ও দাসী
পূজা প্রেম স্নেহ দিয়ে ভরা,
চিরন্তন নরচিত্ত তৃপ্তি যাহে লভে অবিনাশী
সুমঙ্গল সৌন্দর্য-পসরা ;
একই দেহে রমণীয় রমণী সে, বরণীয় নারী,
গৃহ-আশ্রমের শকুন্তলা,

মূর্তিমতী তপশ্চর্যা, অপূর্ব প্রণয়ে মনোহারী
প্রিয়ংবদা-কণ্ঠে কথা-বলা,
মমতার মধুমল্লী দৃঢ়তার স্বর্ণসূত্রে গাঁথা,
স্নিগ্ধ বাসে ভরে দেহ-মন,
প্রদীপ্ত আঁখির 'পরে আয়ত উদার আঁখিপাতা,
মোহমুক্ত মানস-যৌবন ;
আমার এ কাব্য নহে বহুরূপী দ্বিপদী চৌপদী
চরণে চরণে দ্বিচারিণী,
প্রাতঃস্মরণীয়া কন্যা তারা কুন্তী অহল্যা দ্রৌপদী
মন্দোদরী—পঞ্চ প্রবাহিনী ;
মোর কাব্য ত্যজে তনু শিবনিন্দা শুনি পিতৃমুখে,
শিব লাগি জন্ম লয় ফিরে,
সর্বদুঃখে লয় বরি অন্তরের অনির্বাণ সুখে
তপোমগ্না হিমাদ্রির শিরে।

নিরুপায়

শ্রমিকের ফাট্‌ছে পিলে ধনিকের বুটের ঘায়ে,
বণিকের বংশ বাড়ে তেতলা প্রাসাদ-ছায়ে ;
কে খাটে, কেই বা খাটায়? কে বা কাল খেলায় কাটায়
যে বোনে গায়ের কাপড়, সে মরে আদুল গায়ে!

বাহবা বিধির বিধান, বাজা ভাই বাজ্‌না বাজা,
ঢেকে দে ভাব্‌না যত,—দুনিয়ার এম্‌নি রাজা।
চোরেরা বাড়ছে খাসা, সাধুরা কোনায় ঠাসা,
রেখে দে ধর্মকথা, নিয়ে আয় কাঁক্‌ড়া-ভাজা।

ওরে ভাই—বড্ড ক্ষিদে, কী করি বল্‌ তো উপায়,
লাগা না ফন্দি-ফিকির, যা করে মিলবে দু-পাই!
পশুরাও খাচ্ছে চরে, মানুষ ক্ষিদেয় মরে—
ধনীদের ঘর ভরে যায় গরিবের শ্রমের রূপায়।

কত আর সহ্য হবে, বেটারা মোটর চড়ে ;
দু-বেলা পোলাও খেয়ে বসে বেশ আরাম করে!
দেখা হয় পথের ধারে— শুমরে চিন্‌তে নারে,
দু-টাকা চাইতে গেলেই মাথাতে টনক নড়ে।

চুরিটা মন্দ কিসে—সমাজের ফক্কিকারি,
গরিবে রাখতে চেপে বড়দের খবরদারি!
এদিকে পেট জ্বলে যায়, কী হবে পুঁথির কথায়?
পরকাল পচুক চুলায়—বাঁচাটাই কেলেংকারি!

যদি বা ধরাই পড়ি, তাতে আর ভয় কী আছে?
—ছেলেটা ধুঁক্‌ছে জ্বরে, রেখে যাই কার কাছে!
সে মাগী গর্ভে ধরে বেঁচেছে পূর্বে মরে,
একা তাই ভাবছি বসে, কী করে দু-দিক্ বাঁচে!

জমিটার খাজনা দেবার এসেছে জোর তাগাদা,
মোটে যে হয়নি ফসল, জমিদার বুঝবে না তা!
ভিটে মোর সাত-পুরুষে তবু নেয় পয়সা ঠুসে,—
কোথাকার কেমন বিধান, বুঝি না তাও তো দাদা!

মাটি তো সঙ্গে করে আনেনি ধনীর ছেলে,
সে বেটা জন্মে শুধু কী করে দখল পেলে?
চিরদিন লাঙল ধরে এসেছি আবাদ করে—
তার আবার পাওনা কিসের, দিব যে চাইতে এলে!

মাটি তো মাটিই বেটি, মুখে তার রা না কাড়ে,
নইলে ছিদাম দুলে কারুকে এম্‌নি ছাড়ে!
থাক্ তোর আইন কানুন, ঘরে যার জুটছে না নুন,
সে দেবে পয়সা গুনে,—কে বা তা চাইতে পারে!

পেটে যে পায় না খেতে, সে দেবে দেনার কড়ি—
কাকে—যে সোনার খাটে শুয়ে রয় পেট-টা ভরি!
অথচ কুপিয়ে মাটি না খেয়ে মোরাই খাটি—
টাকা তো তৈরি মোদের, তারা পায় কেমন করি?

সাধে কি রাগছি রে ভাই—ছেলেটা কদিন ধরে
বাদলে আমন রুয়ে পড়েছে এম্‌নি জ্বরে!
দেখাব বদ্দি যে ভাই, তারো যে পয়সাটি নাই,
খাওয়াব মিছরি সাবু—তাই বা পাই কী করে।

যাক্‌গে,—মোড়ল দাদা, ঠিলি কি খালিই নাকি!
দ্যাখ না উপুড় করে—দু-ফোঁটা নাই কি বাকি?
ভেবো না ছিদাম দুলে নেশাতে পড়বে ঢুলে,—
নসিবে ঘটবে না তা—তাতে যে ভালোই থাকি।

মাগীটা ভালোই গেছে—কী বল বলাই কাকা?
দুনিয়ায় মরাই ভালো, নাই যার পয়সা টাকা!
—ছেলেটা ধুঁকছে জ্বরে দ্যাখ না মরছি ডরে,
সে মাগী ভাগ্যবতী, পড়েছে চিতায় ঢাকা!

ভগবান! থাকিস্ যদি, একবার আয় তো কাছে,
আমি যে মুখ্যু মানুষ—শুনি কি বলার আছে!
কতদিন লুকিয়ে র'বি? দুনিয়ায় পয়সা সবই—
কথাটা বল্ তো মুখে—বুঝে নিই কতক আঁচে!

মানুষের সাচ্চা-ঝুটার যদি না কদর থাকে,
দেহে যার শক্তি আছে, বুঝানোর কাজ কি তাকে?
অবিচার ভণ্ডামিতে, কেহ নাই দণ্ড দিতে—
যদি হয় এমন ধারা,—কে ফাঁকে ছাড়বে কাকে।

কী বলিস্ মোড়ল দাদা, ভয়ে কি ভড়কে গেলি?
মনে হয়, মাটির মতন দুনিয়াই পাল্‌টে ফেলি।
উঁচু সব ঢেলায় ধরে চষে দিই সমান করে,
পয়সার কোথায় বাসা, দেখি তাই কোদাল ঠেলে!

—রাত, ভাই অনেক হল, ছোঁড়াটা করছে বা কি!
ভালো না লাগছে কিছুই, না-লাগার কসুরটা কী?
সাবু আর মিছরি কেনা— যদি বা তাও হবে না,
তবে এই দুঃখ সয়ে কেন-বা বেঁচেই থাকি?

অনাহূত

পুঁতেছিলাম লতা একটি ঘরের কোণে, অযতনে।
ভেবেছিলাম হয়তো তখন অকারণে, মনে-মনে—
আপনা হতে যদিই তাতে ফুলটি ধরে, দু-দিন পরে,—
কে আর আছে—দিব তুলে সমাদরে, কাহার করে?
আপন বোঁটায় আপনা হতে ক্ষণিক হেসে, দিনের শেষে,
মিলিয়ে যাবে এক নিমেষে হাওয়ায় ভেসে, ঝরার দেশে!

আজকে দেখি অনাদরের কৌতূহলে, রৌদ্রে জলে,
সেই লতাটিই ঘরটি ছেয়ে লতিয়ে চলে ফুলে-ফলে!

মৌমাছিরা কাছ ছাড়ে না মধুর আশে, ফুলের বাসে,
টুনটুনিরা বাঁধছে বাসা পাতার পাশে লতার ফাঁসে ;
ঘর জুড়ে আজ যাওয়া-আসা প্রণয়-ভাষা চল্‌ছে খাসা!
ভাঙা বুকে জুট্‌ল এ কোন্ দু-কূল-ভাসা ভালোবাসা।

মুক্তবেণী

ও কেশ বাঁধিয়া রাখ, মেলিয়ো না আর,
কোরো না নূতন সৃষ্টি—ধরা অন্ধকার
ভরা দিনে, নিবায়ে এ নয়নের আলো ,
বর অঙ্গে বেড়া ওই নীলাম্বরী কালো—
নীলাঞ্জন মেঘসম—যথেষ্ট কি নয়?
মুমূর্ষেরে মারি কিবা শৌর্য-পরিচয়!
রমণীর মন নিয়ে পার না বুঝিতে—
সহনেরও সীমা আছে পুরুষের চিতে!

ওই দেখ—ক্লান্ত রবি দিগন্তের ভালে
বিছায় বিশ্রাম-শয্যা সন্ধ্যাতন্দ্রাজালে ;
পাখিরা কুলায়মুখী ; ঘরে ফিরে চাষি ;
বাজিছে শঙ্খের কণ্ঠে মিলনের বাঁশি
দিকে দিকে।—আর কেন? ঝাঁপিয়া অঞ্চল,
ঝাঁপিতে ঢাকিয়া রাখ ভুজঙ্গের দল।

'স্বপ্নো নু মায়া নু'

এক ফালি জ্যোৎস্নাসম প্রিয়া মোর রহিয়াছে মিশি
শুভ্র শয্যাটির সাথে—মূর্ছাতুরা পূর্ণিমার নিশি!
শ্রাবণের আর্দ্রবায়ে কেতকীর গন্ধ ভেসে আসে
দক্ষিণের বাতায়নে ; নিশীথের নিঃশব্দ আকাশে
কথা কও, কথা কও—ক্লিষ্ট কণ্ঠে কোথা কোন্ পাখি
দূর হতে আরো দূরে উড়ে-উড়ে চলিয়াছে ডাকি।
একটানা ঝিল্লিধ্বনি চলে শুধু স্বপ্নজাল বুনে
শ্রান্তিহীন গুঞ্জরণে,—ঘুম যায় রাত্রি তাই শুনে।

সুন্দরের স্বপ্নাবেশ জীবনের কোলাহল-পারে ;
তন্দ্রার তমিস্রা টুটি জ্যোৎস্না ফেটে পড়ে চারিধারে
মুগ্ধ জাগরণসম,—অথবা সে জাগ্রত স্বপন!
জীবন পড়িছে ঢুলি, ঘুম ভেঙে চাহে কি মরণ?
স্বপ্নসম এ জীবন অমিলে ও গরমিলে ভরা—
ধরার ধারণা-বন্ধে দু-দিন চাহে না দিতে ধরা!
স্বপ্নের কি দোষ তবে? গাহ স্বপ্ন-সুন্দরের জয়—
হোক্ তা ক্ষণিক মিথ্যা,—জীবন তো তার বেশি নয়।

চৈত্র-স্মৃতি

কবে কোন্ অতীতের সুমধুর চৈত্র-দ্বিপ্রহরে
দুটি কাঁচা আম পেড়ে দিয়েছিনু তার কচি হাতে—
স্নিগ্ধ শ্যাম সেই বর্ণ! শেষ-বসন্তের শূন্য ঘরে
সেই মৃদু সৌরভের ছন্দটুকু কাঁপে মলয়াতে!
তুচ্ছ দুটি ফল পেয়ে কী আনন্দে দীপ্ত সে আনন!
মূর্ত পুরস্কার যেন—মনে পড়ে আজো ক্ষণে ক্ষণে!
ঝড়ে-পড়া কত আমে ভরিল এ কানন অঙ্গন,—
সে হাসি ভুলিনি আজো—আলো করে আছে মোর মনে!
—সেদিন নাহিকো আর ; সে যে আজ সিঁদুরে-চন্দনে
গোলাপখাসের মতো রঙে-রূপে পূর্ণ এতদিন,—
অমৃত-নিন্দিত গন্ধে বিতরিছে সে কোন্ নন্দনে
আনন্দের মকরন্দ! দাতা আজি হইয়াছে দীন।
—সেই ভালো, সেদিনের কচি আর কাঁচার-সৌরভ
শূন্যগৃহে পূর্ণ করি তুলুক সে স্মৃতির গৌরব।

আইবুড়ো কালো মেয়ে

সন্ধ্যা-আকাশ নীরবে তখন আঁধার আসিছে ছেয়ে ;
দাওয়ার উপরে ছায়ার মতন বসে আছে কালো মেয়ে।
বিরল বসতি ছোট গৃহখানি, গোটা দুই কোঠা-ঘর ;
অদূরে তাহারি বহিছে 'তুফানী', সম্মুখে বালুচর।

পল্লীর গৃহ—শান্ত রজনী, সাঙ্গ যা-কিছু কাজ,
ডাকিল জননী—উঠে আয় ননী, চুল বাঁধবিনে আজ?

চোরের মতন মেয়ে উঠে এসে বসিল মায়ের ডাকে ;—
কথা যাহা কিছু—চিরুনি ও কেশে, দোঁহে চুপ করে থাকে।

বেড়ে উঠে রাত—দ্বিতীয় প্রহর ; চৌকিদারের সাড়া ;
গরিবের বাড়ি—বিধবার ঘর—দিয়ে যায় কড়া-নাড়া ;
শেয়ালের ডাক মিলাইয়া আসে ঝাউ-ভাঙা বালুচরে
দুইটি শয্যা পড়ে পাশা-পাশি নিশীথ-নীরব ঘরে।

জানালার পাশে সন্ সন্ করি সাড়া দেয় শালবনী,
মা শুধায় শেষে—যেন সে গুমরি—ঘুম এল নাকি ননী?
উত্তর আশে চাপা নিঃশ্বাসে কণ্ঠ যে আসে ছেয়ে—
চেয়ে রহে তাই অন্ধ আকাশে—আইবুড়ো কালো মেয়ে।

থম্ থম্ করে গভীর রাত্রি প্রদীপ-নেবানো ঘরে,
আঁধার পথের যুগল-যাত্রী তুফানীর বালুচরে।
একের যাত্রা শেষ হয়ে আসে, আন্যের যবে শুরু,
কালের কপালে কোন্ পরিহাসে কাঁপে দুটি কালো ভুরু!

একে কালো মেয়ে, দরিদ্র তায়, বয়স—সে বিশ-পার ;
জগতের চোখে কে-বা তারে চায়? নিরুপায় চারিধার!
তবু এ রজনী শেষ হয়ে যাবে—যতই ফাটুক বুক!
কাল প্রাতে কোথা নিস্তার পাবে? দেখাতে হবে না মুখ।

ফণী-মনসার ফুল

মরুমালঞ্চে আমি কাঁটা-ঘেরা ফণী-মনসার ফুল—
প্রকৃতির এই সৃজনকাব্যে রূঢ় ছন্দের ভুল!
তবু এই বুকে বসে মৌমাছি,
টুনটুনি এসে করে নাচানাচি,
প্রজাপতি তার পালক বাঁচায়ে ঘুরে-ফিরে চারি পাশে ;
শরশয্যায় শুয়ে-শুয়ে তবু মুখে মোর হাসি আসে!
পুষ্পসভাব বিদ্রোহ আমি, কোথা কোমলতা মোর,
মালার বাঁধনে বাঁধিতে আমারে জগতে নাহিকো ডোর।
যত যূথি-জাতি-বেলা-মল্লিকা
বকুল-করবী-চাঁপা-শেফালিকা

বাতাসের সাথে মাথাটি পাতিয়া সবারে নোয়ায় শির ;
আমি উদগ্র ছন্দোভঙ্গ পুষ্পিত ধরণীর।
এই প্রকৃতির কাব্য-রাজ্যে আমি যে ন্যায়ের ফাঁকি ;
কাঁটা-আঁটা মোর মনের মর্মে জানিতে কী আছে বাকি!
বিলাসের হাটে নাহি মোর আশা,
তাপসের ঠাটে আমি দুর্বাসা!
নরমের ঠাঁই নাই এ ধরায়, সবাই দলিয়া চলে,
কাঁটার বর্মে কঠিন এ হিয়া. ভিজি না চোখের জলে।
ফণী-মনসাব ফুল আমি, তাই ফণী-নিশ্বাসে ভরা,
সুরভির আশে যেবা আসে পাশে,—কারেও দিই না ধরা,
জগতের দশা হেরিয়া নয়নে,
আসন পেতেছি কাঁটার শয়নে,
আপনারে নিয়ে থাকি আনমনে, ধারি না কাহারো ধার ;
ভুল বল ভুল, ফুল বল ফুল আমি ফণী-মনসার।

দোলের দিনে

রঙ্গময়! এ কী রঙে রাঙাইলে এ নব ভুবন!
কোথায় সে রসলীলা, কোথা সে আনন্দ-বৃন্দাবন?
চির-সুন্দরের সাথে চির-সুন্দরীর হোরিখেলা—
নবীন বসন্তে আজি কই সেই সুন্দরের মেলা?
পথঘাট তরুলতা রাগরক্ত আবিরে-আবিরে,
কুঙ্কুমের কুয়াশায় ধরণী রাঙিয়ে উঠে ধীরে,
মুখে-হাসি ব্রজবাসী সাজি নব গুলাবে ও ফাগে
রাধাশ্যাম-রসগাথা গাহিয়া চলেছে অনুরাগে,—
—সেদিন কোথায় গেল?
চেয়ে দেখি আজি চারিধারে
ব্যথাতুরা বসুন্ধরা ভরিয়া উঠেছে হাহাকারে!
সবল দুর্বলে হানে ; শক্তিসুরামত্ত দৈত্য দল
নিত্য নব অত্যাচারে বঞ্চিতেরে লাঞ্ছিছে কেবল!
জলেস্তলে-অন্তরীক্ষে মরণের ধারাযন্ত্র ছুটে
হিংসা-পিচিকারি মুখে—ভয়ে বিশ্ব শিহরিয়া উঠে!
শক্তিশেল ফাটি পড়ে চারিদিকে কুঙ্কুমের মতো
ছড়ায়ে মৃত্যুর বীজ—সৃষ্টিনাশে উদ্দাম উদ্যত!

নগ্নিকা কালিকা নাচে তাথৈ তাথৈ চারিধারে,
ধূমায়িত ধূমাবতী বিষবাষ্প-আচ্ছন্ন আঁধারে,
রঙ্গময়! এ কী রঙ্গ? কই সে আনন্দ-বৃন্দাবন?
এ যে সর্বনাশা হোলি! এ কী লীলা হেরি, নারায়ণ!

চিতার সিঁদুর

কোন্ গ্রাম নাহি জানি, বেঁধেছিনু তরীখানি,—
তারি পাশে ঘাটের কিনারে ;
সারাদিন দেখি চেয়ে যত-না গ্রামের মেয়ে
জল নিতে আসে তারি ধারে।
অদূরে বাদাড়-বুকে নদীর বাঁকের মুখে
ভাঙা পাড়ে গ্রামের শ্মশান ,
নীলাকাশে অগ্নিশিখা লেখে তার রক্ত লিখা-
জ্বলে চিতা নিশি-দিনমান!

রয়েছি আপন কাজে, অদূরে কাঁকন বাজে,—
চকিতে চাহিয়া দেখি ফিরে—
ঘাটের সোপান বাহি— লাজের বালাই নাহি,
দুটি সখী নেয়ে গেল নীরে!
সুরভিত স্পর্শে তারি তখনো টলিছে বারি!
শুনি 'বল হরি, হরিবোল'—
চমকি দেখিনু চাহি, চলে নদীতীরে বাহি
—বাঁধা শব কাঁধে খায় দোল!

পরদিন উষারাগে নদীজলে ছোপ লাগে
জেগে উঠি সানাইয়ের স্বরে,
দেখি, নববধূবেশে, অশ্রুভরা হাসি হেসে—
মেয়ে চলে শ্বশুরের ঘরে ;
সজ্জিত তরণী দুটি তীরের বাঁধন টুটি
গেল ভেসে রেখা রেখে তার,
শূন্য হল নদীতীর, শান্ত হয়ে এল নীর,
তরী মোর কাঁপেনাকো আর!
কাটেনি সাতটি দিন,— শুধিতে স্মৃতির ঋণ
বড় বেশি নাই আর বাকি,

লিখি, পড়ি, ঘুম যাই,   তরঙ্গের দোল খাই—
          দিগন্তে মেলিয়া দুটি আঁখি ;
একদিন সন্ধ্যাকালে   হেরিনু শ্মশান ভালে
          ধু ধু করে ধরে উঠে চিতা ;
শূন্যে যাহা গেল মিশে,   সেদিনের বধূই সে।
          সেই রাতে খোঁজ পেয়েছি তা।

ঢল নামে, নদী কূলে,   তরীটি দ্বিগুণ দুলে ;
          কূলে কূলে টাবুটুবু জল ;
কিবা দিবা—কিবা নিশি,   তীরে নীরে যায় মিশি—
          কেবা স্থির—সবই যে চপল।
এই আছে, এই নাই   মিছে তরী বাঁধো ভাই—
          মৃত্যুস্রোতে জীবন ভাসাও ;
পরপার থাকে থাক্,   না থাকে, চুলায় যাক্,
          হাল ছেড়ে পাল তুলে দাও।

লীলা

একটি করে তৃণ একটি মাস বহি চঞ্চুপুটে সযতনে,
ছোট্ট পাখিদুটি বেঁধেছে নীড়খানি নিভৃত ভাণ্ডীরবনে।
          ফুলের বুকে সুখে দুজনে মধু খায়,
          ফুলেরি বাসে পাশে দুজনে ঘুম যায়,
ভুলাতে দুজনারে দুজনে গান গায়—দুজনে বসে তাই শোনে।

ছোট্ট পাখিদুটি, কত না আশা বুকে, বেঁধেছে ছোট বাসাখানি,
বিরাট ধরণীর অজানা কোন্ কোণে—কতই ছোট সে, না জানি
          যতই ছোট হোক্, ভাবনা-ভয়ে ভরা,
          ব্যথার কাঁটাঘরে নিয়ত বাস-করা,
কখন্ কোন্ দিকে কবে যে পড়ে ধরা—কে কোথা নিয়ে যায় টানি!

ভাঁটের থোকা ভরি বিকশে মঞ্জুরি ফাল্গুনী হাওয়া গায়ে লেগে,
পাখির বুকে ঠোঁটে দ্বিগুণ রং ফোটে, কণ্ঠে সুর ওঠে জেগে ;
          তিনটি ছোট ডিমে ভরেছে বাসাখানি,
          শিয়রে জাগে তারি ছোট্ট দুটি প্রাণী,
পাখাতে ঢাকি তারে আদরে লয় টানি অজানা ব্যাকুলতাবেগে।

ক্ষুদ্র জীবনের মুগ্ধ খেলা হেরি রুদ্রদেব বুঝি হাসে ;
দীপ্ত জ্যোতি তারি রৌদ্র-রূপধারী উর্ধ্বে ফুটে নীলাকাশে!
সংখ্যাতীত জীব পঙ্কে মাথা কুটে,
উপরে নাকি তারি শূন্যে ফুল ফুটে!
নমিছে লীলা হেরি ভক্ত করপুটে, চক্ষু ধারাজলে ভাসে!

ভাঁটের ভাঙা বুকে এসেছে ভাঁটা পড়ে, ফুলের মেলা হল কানা ;
কালোর পাল তুলে কালের বৈশাখী কাননে দিল আসি—হানা ;
মোহের বন্ধনে দণ্ড যেন দিতে
মাতিল সমীরণ গরজি ধরণীতে,
কোথায় দুখসুখ দুঃখসুখাতীতে, কে করে কারে আজি মানা!

কোথায় গেল উঠে ভাঁটের খোলাভাঁটি, কোথায় গেল উড়ে পাখি,—
কোথায় গেল ভেঙে সাধের বাসাখানি, কোথায় শাখা, কোথা শাখী?
বিহগী ডানাভাঙা লুটায়ে ভুঁয়ে পড়ি,
শূন্যে উঠে হাসি—'হা-হা'-য় হাওয়া ভরি!
বৈতরণীতীরে তরণী পার করি মরণে দিবি কে রে ফাঁকি!

শিশুর নেশা

টলমল টলমল টলিছে চরণ,
এই উঠে, এই বুঝি পড়ে!
মদহীন মত্ততায় হৃদয়-হরণ
কে এল রে মানবের ঘরে
অস্পষ্ট জড়িত কণ্ঠে, ভাঙা-ভাঙা বোল,
মুখময় ঝরিতেছে লালা,
কথার নাহিকো অর্থ—আবোল-তাবোল
ভরে তোলে প্রাণের পেয়ালা!
না জানে শরম লজ্জা, কটির বসন
খসে পড়ে যেখানে-সেখানে,
নাহি চাহে সাজ-সজ্জা, চির নগ্ন মন
বাহিরের বাঁধন না মানে।
ধুলায়-কাদায় সদা যায় গড়াগড়ি
কোথা মান কোথা অপমান!
ভালোমন্দ নাহি বুঝে, আপনা পাসরি
ঘরে-পরে করে সে সমান।

আপন খেয়ালে মত্ত, মহানন্দে ভুলে
আপনাতে আছে নিত্য ভোর
বিনা মদে মাতে, আরো মাতাইয়া তুলে
মানবের চির-চিত্তচোর!

কাজলা দীঘি

আমাদের এই কাজলা-দীঘির কাজল-কালো জলে
নিত্যি বাজে জলতরঙ্গ হাসির কোলাহলে ;
ছেলের দলে তালের ডোঙায় কেউ-বা খেলে বাঁচ,
কেউ বা শুধু সাঁতার কাটে, কেউ-বা ধরে মাছ।

নানানতর মেয়ের মেলা নিত্যি-সকাল-সাঁঝে—
কলশ-ভরার, কাপড়-কাচার, বাসন-মাজার কাজে ;
গল্প তাদের ফুরায় না আর—কতই কি-যে কথা,
তরল চোখে জলের মতোই চপল চঞ্চলতা!

নাইকো কোনো বয়স-বাধা—অবাধ-মেলামেশা—
ঘরের কাজের ছুটির ফাঁকে মুক্তি-পাওয়ার নেশা ;
সন্ধ্যা-আঁধার নামে যখন শ্যাওড়া-বনের পাশে,
জলের গায়ে ঘটের ঘায়ের ঢেউ মিলিয়ে আসে।

সবার যখন কাজ মিটে যায়, আবছা-অন্ধকারে
একটি বুড়ি নিত্যি দেখি—আসে ঘাটের ধারে ;
নাইকো তাহার কলশ-ভরা, নাইতে নাহি আসে,
চুপটি করে বসে থাকে পৈঠাগুলোর পাশে।

মাটির একটা প্রদীপ জ্বেলে ভাসিয়ে দেয় সে জলে,
ঠোঁট দুটো তার কাঁপে—কী যে বিড়্‌বিড়িয়ে বলে!
খানিক পরে যেমন আসে, তেমনি ফিরে যায়—
ঘাটের বাঁকে, গাছের ফাঁকে—তটের কিনারায়।

মনের খবর জানিনে তার—কোন্ কামনায় ভরা,
শেষ বয়সে কিসের আশে এ আয়োজন করা!
জানলা হতে নিত্যি দেখি, নিত্যি মনে ভাবি—
পাগল বুঝি!—খোলে না আর কৌতূহলের চাবি।

প্রশ্ন করার পাইনে সাহস, কেবলই হয় মনে—
মিছে কেন আঘাত দিতে যাই অজানা জনে!
জানলা থেকে নিত্যি দেখি,—সন্ধ্যা যেমন আসে,
আঁধার-মুখে জলের বুকে দীপটি তাহার ভাসে!

অবশেষে শুনতে পেলাম—বছর বিশেক আগে,
ওই যেখানে ভাঙা ঘাটের—পৈঠা কটা জাগে,
একটিমাত্র ছেলে যে তার ছিল 'বিষণ' বলে—
সেখান থেকে. কেউ জানে না—কোথায় গেছে চলে!

সেদিন সে ওই জলের বুকে বেঁধে কলার ভেলা,
এক-বয়সী ছেলের দলে খেল্‌তে গিয়ে খেলা—
হঠাৎ কোথায় হারিয়ে গেল, সন্ধ্যা-অন্ধকারে ;
পাড়ার লোকে খুঁজতে এসে কেউ পেল না তারে!

সঙ্গীসাথী কেউ তো তারে দেয়নি জলে ফেলে?
আঁধার পথ পায়নি বুঝি একলা মায়ের ছেলে!
সেই থেকে আজ বিশটে বছর হারিয়ে-যাওয়া ধন
প্রদীপ জ্বেলে নিত্যি খোঁজে অন্ধ মায়ের মন।

শেষের রাত

ভাদ্রমাস ; দূর প্রবাস ; পরের দাস ; সঙ্গীহীন ;
দ্বিপ্রহর; রুদ্ধঘর ; শূন্যচর ; দীর্ঘদিন ;
গ্রন্থ নাই—কর্ম-ছাই ; ঘনায় মেঘ ; বদ্ধদ্বার ;
বিরামহীন বর্ষাদিন ; অন্ধকার—অন্ধকার!

রুগ্‌ণকায় ; নিদ্রা নাই ; দীর্ঘরাত—একলা তায় ;
বারম্বার সঘন-ধার বৃষ্টি হয়,—নিঃসহায়!
দমকা বায়—চমকে চাই ; কে দেয় ডাক—হয়তো সেই!
দ্বারের ফাঁক—হাওয়ার হাঁক, নয়গো নয়—কই, সে নেই।

বাড়ছে ঝড় ; কড়াৎকড়—বজ্রাঘাত—দগ্ধবন!
কোথায় যাই—উপায় নাই ; লাগছে ভয়,—শূন্য মন!
হাওয়ার হাঁক ; ব্যাঙের ডাক ; ঝিঁঝির শাঁখ চিরছে বুক,
যায় যে রাত দাও গো হাত ; আর কখন?—দীপ নিবুক।

শিশুর ব্যথা

বোকা ছেলেটার ভারি মুখ ভার, খেলাধুলা সব মাটি ;—
হারিয়ে ফেলেছে বাপের-দেওয়া সে রথে কেনা লাল লাঠি!
দূর প্রবাসের কাজের তাড়ায় পিতা আজি কাছে নাই,
লাঠির সঙ্গে তাঁরি কথাটাই আগে মনে পড়ে তাই ;
সেই স্নেহমাখা হাসি মুখখানি যতবার মনে জাগে,
ততোবারই চোখে ভরে আসে জল, কিছু ভালো নাহি লাগে!

কাকা এসে বলে—'কী হল রে বোকা, দু-আনা তো তার দাম,-
সে আবার লাঠি—এত কাঁদাকাটি তারি লাগি—আরে রাম!'
—বলিতে পারে না, বুঝাতে পারে না ব্যথাটি যে কোন্‌খানে ;
লাঠির সঙ্গে বাপের কথাটি মনে পড়ে, তাই জানে!
সরল মনের তরল পাতায় বাপের সে ভালোবাসা
অবুঝ গোপনে কোথা কোন্ কোণে বিজনে বেঁধেছে বাসা!

সন্ধ্যাবেলায় দাদা এসে বলে, বিজ্ঞতা পরকাশি—
'এই দ্যাখ্ বোকা, এক টাকা দিয়ে আনিলাম কিনে বাঁশি!
ভারি তোর লাঠি দু-আনা দামের! লোকে শুনে হাসে, ছি!
কাছে আয় সরে, বাজাবি কী করে, আগে তা শিখিয়ে দি।'
কোথায় দু-আনা, কোথা এক টাকা, লাঠির বদলে বাঁশি!
শিশুর হৃদয় তবু যে বোঝে না—ভাবিয়া কাঁদি না হাসি!

বয়ঃসন্ধি

মুকুলের বার্তা বহি তনুলতা আরক্ত পল্লবে,
চপল চোখের ভাষা লভিয়াছে বাণীর সন্ধান ;
গালের গোলাপজাম পরিপুষ্ট গোলাপি গৌরবে,
কৃষ্ণসায়রের জলে কালো কেশ করে নিত্যস্নান!

মঞ্জরিত বক্ষতলে রহস্যের মন্দার-মঞ্জরি
আপন গোপন বাস সবিস্ময়ে খুঁজিছে গোপনে ;
শ্রীঅঙ্গের ঋজু রেখা বঙ্কিম ভঙ্গিতে উঠে ভরি ;
মুখরতা মৌন হয়ে নেমে আসে চঞ্চল চরণে!

মন্দির মেলিছে চূড়া ; দূরে বাজে মিলনের বাঁশি
বিগ্রহের অপেক্ষায় শূন্য পড়ে আছে হৃদি-পাট ;
অশ্রুর কুয়াশা-আড়ে মিলায় উচ্ছল কলহাসি,
অজানার আকিঞ্চনে মুক্তি মাগে মর্মের কপাট!

সর্বাঙ্গে লাগায়ে দোল অন্তরের বসন্ত-উৎসব
হানে রঙ্গ-পিচিকারি—অলক্ষিত হাসে মনোভব!

বিয়োগিনী

গৃহলক্ষ্মী নহ শুধু, তুমি দেবি, ছিলে মোর রানী ;
তব স্পর্শে প্রাণ পেয়ে আমার এ চিত্তবীণাখানি
মুখরি উঠিত নিত্য,—জানুক বা না জানুক কেহ ;
অত্যুক্তি বলিয়া এরে বন্ধুজনে করিবে সন্দেহ,
জানি তাহা ; কিন্তু এই অন্তরের তন্ত্রীর বারতা
তুমি ছাড়া কে জানিবে? কে বুঝিবে এর মর্মকথা!
আজ তুমি ছেড়ে গেছ ; পড়ে আছে অন্ধকার কোণে
যন্ত্রের কঙ্কালখানা—কে আর কাহার কথা শোনে!
ধূলি-জালে ঢাকে নিত্য, বায়ু আসি নাড়া দিয়ে যায়,
হা-হা করে কাঁপে বক্ষ ; আজি হায়, সে ধ্বনি কোথায়?

সে বীণা তো আবর্জনা, বুকে যার নাহি বাজে গান।
দুর্দিনের অন্ধকারে আজি তাই ভাবি, ভগবান!
ফিরাইয়া লহ এই যন্ত্রটারে তব অন্তঃপুরে,—
আর কেন এ যন্ত্রণা,—আর কেন রই সৃষ্টি জুড়ে!

২

কাল যে অচেনা ছিল, আজ সেই চেনা ;
দু-দণ্ডের পরে তারো ঠিকানা মিলে না!
—এই তো ধরার ধারা ; ধরা ও অধরা—
দুই নিয়ে খেলা ঘরে মিছে ঘর-করা!

বাহির হইতে তুমি এসেছিলে ঘরে
নিতান্ত বুকের কাছে, আগ্রহে আদরে
একান্ত আপন হয়ে ; ভেবেছিনু মনে
এ চেনা হবে না শেষ বুঝি এ জীবনে।

—মুখ তুলে চেয়ে দেখি,—তুমি গেছ চলে—
যাবার সময় কোনো কথাটি না বলে!

মন দিয়ে বুঝি, তবু প্রাণ দিয়ে কাঁদি,—
বৃথায় বালির বাঁধে মর্মতল বাঁধি!
মনে হয়, সবই মিথ্যা—তবু চিত্তজ্বালা
নিত্য ভরে তুলে কেন চোখের পেয়ালা!

৩

তেমনি প্রচণ্ড গ্রীষ্ম আজো দ্বিপ্রহরে,
কিন্তু কোথা সে চাঞ্চল্য? সেই ক্ষিপ্র করে
নিরলস ব্যগ্রতায় সেই পাখা-করা?
কোথায় সে ভাষাহীন শত প্রশ্নভরা
আয়ত করুণকান্ত সেই মুগ্ধ আঁখি?
এস, এস—নিঃসহায় আমি যে একাকী!

বৈকালে বৈশাখী মেঘে আচ্ছন্ন আকাশ,
হুহু করে ফেলে বায়ু উতলা নিশ্বাস।
'—ওগো, ওগো, একবার ছাতের উপরে
এস, এস,—দেখ, দেখ,'—সেই স্নিগ্ধস্বরে
কোথা সেই প্রাণস্পর্শী আগ্রহের ডাক?
ডাকো, ডাকো,—একা আমি—এল যে বৈশাখ।
ডাকো, ডাকো,—ডাকে মেঘ, নামে বৃষ্টিধারা,
নিঃসহায়, বড় একা—আমি সর্বহারা।

৪

এই তো আসিনু ফিরে, কিন্তু তুমি কই?
তবে যে ফিরিল ঘরে—সে কি আমি নই!
নহিলে—কোথায় তুমি সরিয়া দাঁড়ালে
আধ-খোলা দুয়ারের আধেক আড়ালে?
সেই গৃহ, গৃহসজ্জা, ভৃত্য পরিজন,
পুত্রকন্যা,—সেই সব পূর্বের মতন!
তবে কি সকলি স্বপ্ন বিভ্রান্ত নয়নে?

তুমি নাই—সেই প্রশ্ন জাগে তাই মনে!
সব সত্য, তুমি মিথ্যা—বুঝিব কি তাই?
অথবা সে তুমি ছাড়া আর সত্য নাই!

—চিত্তের বিকার একি?—দেহ কেন টলে?
জল দাও, পাখা আন—কোথা গেলে চলে?
—বুঝিলাম তুমি নাই, নহিলে নিশ্চয়
এ সময়ে থাকিবে না—এও কভু হয়?

৫

সেই চিঠি—ভুলে-ভরা সেই চিঠিখানি—
যা নিয়ে কতই দ্বন্দ্ব, কত টানাটানি
পরস্পরে! কত লজ্জা, কত অভিমান—
মনে আছে? শনিবারে আসার আহ্বান?
—মনে পড়ে?—আজ সেই চিঠি হাতে করে
কতক্ষণ বসে আছি এক-ই আশা ধরে—
হেরিব আবার সেই মুখ-ভার-করা,
—চেঁচিয়ে পড়িতে সেই মুখ চেপে-ধরা!
আজি আর নাই তুমি সে পত্রের পিছে:
প্রত্যেক ছত্রটি তাই চিৎকারি মরিছে
নিঃশব্দ শোকার্ত কণ্ঠে প্রত্যেক অক্ষরে,
কালো-কালো চক্ষে তার যেন অশ্রু ঝরে!
আজি মানিলাম হারি,—চাহ এইবার,
এখনি ফিরায়ে দিব—সে পত্র তোমার!

৬

এত কি সংসার-কাজে ব্যস্ত নিরন্তর!
একদণ্ড বসিবার নাহি অবসর
সারাদিন? এব ভার—আর তার ভার,
ছোট বড়—সবই তব—আশ্চর্য ব্যাপার!
আমি কি তোমার তবে এ সংসার ছাড়া?
তবে যে বিদ্রূপ করে বলে সারা পাড়া
তুমি মোর অনিমেষ নয়নের তারা—
নিত্য যে-বা দেয় মোরে অক্লান্ত পাহারা!

জিজ্ঞাসিলে মৃদু হাসি মুখপানে চেয়ে
কহ শুধু দুটি কথা—'এ সংসার ছেয়ে
তুমিই তো ঘরে-পরে আছ সর্ব ঠাঁই,
তোমারে সবাতে তাই লভি সর্বদাই'!
—তাই নাকি?—তাই বুঝি ছাড়িয়া আমারে—
সেথাও পেয়েছ মোরে সেই পরপারে!

৭

যে ফুল বাসিতে ভালো, সেই চাঁপা ফুল
হাতে নিয়ে বসে আছি স্বপ্নসমাকুল
আজি এই জ্যোৎস্নারাত্রে দেবের দুয়ারে।
চন্দ্রালোকে স্নাত বিশ্ব। লাবণ্য-জোয়ারে
ভেসে যায় দশদিক্। কোথা নাই কেহ।
ঝিল্লিস্বরে ঝিম্‌ঝিম করে আসে দেহ।
—মনে হল, তুমি যেন সন্তর্পণে আসি
নতনেত্রে ফুলটিরে নিলে ভালোবাসি
হাত হতে। তারপরে, অভ্যস্ত ধরনে
চক্ষু মুদি অর্পিলে তা শিবের চরণে।

শূন্যে মিলাইল মূর্তি দেখিলাম চেয়ে ;
ফুলের সৌরভমাত্র আসে জ্যোৎস্না বেয়ে
রূপ হতে অরূপের মন্দিরের তলে—
নোয়াইনু ক্লান্ত শির নয়নের জলে।

৮

ওই তো তোমারি গাছে ফুটেছে সে ফুল,
যে ফুলের লাগি তুমি অশান্ত আকুল
আগ্রহে খুঁজিতে ফিরে প্রতিদিন প্রাতে ;
ফুটেছে তা কালকারই অন্ধকার রাতে,
তুমি চলে গেলে পরে। তোমারি সেবায়
যে ফুল ফুটিল—আজি কাহারে সে চায়?

সহসা তাহার পানে মেলিতে এ চোখ
অন্যমনে হেরিলাম, নির্মল আলোক
তব দুটি নয়নের নবরূপে সাজে
অপরাজিতার সেই পর্ণদল মাঝে।
—সে চোখ চাহিছে কারে—মোরে না তোমারে,
এ পারে, না ধরণীর সেই পরপারে?
সে আলো নিবায়ে যাবে—মুদিবে সে আঁখি,
মোর চোখে এ আলোর কতক্ষণ বাকি?

৯

চাহি না জ্যোছনামত্ত ফাল্গুনের পূর্ণিমা-শর্বরী,
পুষ্পগন্ধে উচ্ছ্বসিত দক্ষিণের সুমন্দ পবন ;

আমি চাই শুচিশুভ্র শরতের পুণ্য কোজাগরী,
লক্ষ্মীর চরণপ্রান্তে যেদিন উৎসর্গ করি মন
জাগরণে কাটে নিশি, প্রসন্ন আকাশ পানে চাহি,—
লহ লহ লহ বলি যে দিল পরান উঠে গাহি।

—সে গান শুনেছ কানে—সর্বস্ব আমার,
তাই লয়ে ভাঙিয়াছ সর্ব অহংকার!
তাতেও নাহিকো দুঃখ—তোমারি যা দান
সব ফিরাইয়ে লয়ে রেখেছ সম্মান!
বিশ্বজিৎ দানযজ্ঞে দাতার প্রার্থনা
হে লক্ষ্মী, তোমার পায়ে পূর্ণ আরাধনা ;—
কিন্তু সেই সঙ্গে দেবি, আমারেও লহ,
এ জীবন ভার তুমি জান তো অবহ!

১০

আমার দুয়ার ছেড়ে খুঁজে নিলে হরির দুয়ার!
—সেই ভালো, সেই ঠিক ; জীবনের ক্ষণিক জুয়ার
ক-দিন রাখিব ধরে? সেই পঙ্ক, সেই তো শৈবাল—
ভরা এই শীর্ণ নদী! সেথা যে অমৃত-পারাবার!

ওইটুকু ছিলে তুমি, সহসা হইলে এত বড়।
তোমারি মাঝারে দেখি, সারা সৃষ্টি হইয়াছে জড়—
তিলে তিলে পলে-পলে সঙ্গোপনে মনের নয়নে!
যা-কিছু দেখি এ চোখে—বারবার শুধু পড়ে মনে
সে তব সুন্দর মূর্তি—সেই শান্ত, সেই সু-সংযত
দীর্ঘপক্ষ্মচ্ছায়াতলে আয়ত নয়ন অবনত!
—এই রাত্রি-অন্ধকারে, নিরালায় এ পরমক্ষণে
একবার কথা কও—কও কথা একান্ত গোপনে।
যে দ্বারে গিয়াছ চলি, একবার খুলি সেই দ্বার
হরির দোহাই, আজি একবার—ডাকো একবার।

হর-পার্বতী

পার্বতী বলে, ঘর করি এস,
শিব বলে, চল ঘর ছাড়ি,—

এম্‌নি করিয়া চির-দিন দোঁহে
সংসার পারে সংসারী!
ধরায় অধরা গিরি-কৈলাস,
মুক্ত আকাশ, মুক্ত বাতাস,
বন্ধ-মুক্তি যুগলমূর্তি
ইহ-পরকাল কাণ্ডারী।

অন্নপূর্ণা পারে না মিটাতে
ক্ষুদা তার, যে-বা অন্নহীন,-
কুবের যাহার ভাণ্ডারী—সেই
চিরভিক্ষুক জন্মদীন!
দিগম্বরের অম্বর 'পরে,
স্বর্ণ-গোধূলি ঝলমল করে,
দক্ষিণে হাসে সিদ্ধি বিধাতা,
বামেতে লক্ষ্মী বক্ষ-লীন।

নাচে মহাকাল—শিরে জটাজাল,
ঘনায় নিশীথ-অন্ধকার ;
লুকায়ে গোপনে গৌরীর দেহে
চন্দ্র দুলায় চন্দ্রহার।
মুক্তি যতই চাহিছে বাহিরে,
বন্ধন যেন ততো ধরে ঘিরে,
সীমায়-অসীমে মিলায়ে বিশ্ব
গাহে মহাগীতি বন্দনার।

জীবনীপঞ্জি

জন্ম : ১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দের ২৭ নভেম্বর (১২৮৫ সালের ১২ অগ্রহায়ন) নদীয়া জেলার যমশেরপুর গ্রামের প্রখ্যাত বাগচী-পরিবারে যতীন্দ্রমোহনের জন্ম। পিতার নাম : হরিমোহন বাগচী (১৮৪১-১৯০৭)। মাতা : যুগিন্ধা গ্রামের আনন্দচন্দ্র রায়ের কন্যা গিরীশমোহিনী দেবী।

শৈশব : যতীন্দ্রমোহনের শৈশব ও বাল্যকাল অতিবাহিত হয় যমশেরপুর গ্রামে। যমশেরপুর ছাত্রবৃত্তি স্কুলে প্রাথমিক শিক্ষালাভ। মুর্শিদাবাদেও বাগচীদের অনেক জমিজমা এবং বহরমপুরে একটি কাছারি-বাড়ি ছিল। বাল্যকালে যতীন্দ্রমোহন কিছুদিন বহরমপুরে ছিলেন এবং খাগড়ার লন্ডন মিশন স্কুলে পড়াশোনা করেন।

শিক্ষা : ১৮৯০ সালে ১২ বছর বয়সে কলকাতায় এসে হেয়ার স্কুলে ভর্তি হন। সেখান থেকে ১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দে দ্বিতীয় বিভাগে এন্ট্রান্স পরীক্ষায় এবং ১৮৯৮ সালে তৃতীয় বিভাগে এফ.এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তখন থেকেই তিনি কাব্যচর্চায় আত্মনিয়োগ করেন এবং প্রথাগত পড়াশোনায় কিছু ঔদাসীন্য দেখা দেয়। বি.এ পড়েন প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে; কিন্তু বি.এ পরীক্ষা দেন ১৯০২ সালে 'ফ্রি চার্চ অফ স্কটল্যান্ডস ইনস্টিটিউশন অ্যান্ড ডাফ কলেজ' থেকে।

বিবাহ ও গার্হস্থ্য : ১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দে এফ.এ পরীক্ষার পরেই বরাহনগর-বনহুগলির জমিদার নিমচাঁদ মৈত্রের কনিষ্ঠা কন্যা ভবিনী দেবীর সঙ্গে বিবাহ। দাম্পত্যজীবন ছিল সুখের; সুযোগ্যা সহধর্মিনী ছিলেন ভবিনী। তাঁর অনেক রচনা ও কবিতা পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত। তাঁদের দুই পুত্রসন্তান : মণীন্দ্রমোহন ও ফণীন্দ্রমোহন; দুই কন্যা : লীলা ও ইলা। ১৯৩৮ সালের এপ্রিল মাসে ভবিনী দেবীর আকস্মিক প্রয়াণে দৈহিক ও মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হন যতীন্দ্রমোহন। তাঁর শেষ জীবন কাটে ছেলেমেয়ের সান্নিধ্যে।

কর্মজীবন : প্রথম জীবনে যতীন্দ্রমোহন ছিলেন বিচারপতি সারদাচরণ মিত্রের প্রাইভেট সেক্রেটারি। সারদাচরণের সাহচর্য তাঁকে প্রথম যৌবনেই সাহিত্যিক-মহলে পরিচিত করে। ১৯০৯ সালে নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের

'বিদ্যাপতি ঠাকুরের পদাবলী' সংকলনে সহায়তা করেন। কিছুদিন কলিকাতা কর্পোরেশনের লাইসেন্স ইন্সপেক্টরের কাজ এবং তৎপরে নটোরের মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ রায়ের প্রাইভেট সেক্রেটারির কাজ করেন। মহারাজের মৃত্যুর পর জীবিকার নানাক্ষেত্রে তাঁর বিচরণ। এফ. এন. গুপ্ত কোম্পানির ম্যানেজারের কাজ; ১৯৩৭-৩৮ সালে বাজপেয়ী কলিয়ারিতে কাজ; কখনো বা ব্যবসা ও শেয়ারমার্কেটের অনিশ্চিত কাজে নিয়োজিত হন।

গ্রন্থ : কাব্যগ্রন্থ : ১. লেখা (১৯০৬); ২. রেখা (১৯১০); ৩. অপরাজিতা (১৯১৩); ৪. নাগকেশর (১৯১৭); ৫. বন্ধুর দান (১৯১৮); ৬. জাগরণী (১৯২২); ৯. কাব্যমালঞ্চ (১৯৩৬); ১০. পাঞ্চজন্য (১৯৪৮)।

উপন্যাস : পথের সাথী (১৯২৩)

প্রবন্ধ: ১. পল্লীকথা(১৯০৫), ২.রবীন্দ্রনাথ ও যুগসাহিত্য(১৯৪৭)।

অন্যান্য রচনা : গ্যালিভারের ভ্রমণবৃত্তান্ত (বঙ্গানুবাদ)।

গদ্য-গ্রন্থাবলী : 'বিচিত্র কথা'

পাঠ্যপুস্তক : শিশুপাঠ (১ - ৪ ভাগ), প্রাথমিকা (১ - ৪ ভাগ), চরিতকথা-ইত্যাদি।

পত্রিকা-সম্পাদনা : ১. মানসী (ফাল্গুন ১৩১৭ থেকে চৈত্র ১৩২০ সংখ্যা)।
২. যমুনা (একাদশ ও দ্বাদশ বর্ষ ১৩২৮-১৩২৯)।
৩. ছোটদের বার্ষিকী (চতুর্থ বর্ষ, আশ্বিন ১৩৪০)।
৪. পূর্বাচল (মাঘ ১৩৫৩ থেকে মাঘ ১৩৫৪)।

মৃত্যু : পত্নী ও দুই কন্যার অকালবিয়োগে দীর্ঘদিন অসুস্থ কবি ১৯৪৮ সালের ১ ফেব্রুয়ারি লোকান্তরিত হন।